বিশেষ সংখ্যা

মার্চ ২০২২ ■ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র

বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা

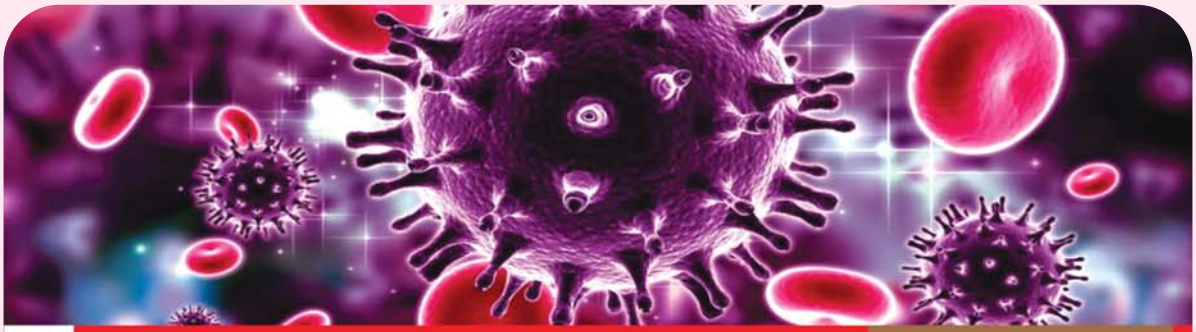

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মার্চ ২০২২ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬শে মার্চ ২০২২ রাষ্ট্রপ্রতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ শেষে দাঁড়িয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান– পিআইডি

সম্পাদকীয়

মার্চ মাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনাবহুল অবিস্মরণীয় একটি মাস। এ মাস বাঙালি জাতির জন্য যেমন গৌরবের তেমনি ২৫শে মার্চের গণহত্যার জন্য এটি একটি বেদনারও মাস। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এই ভাষণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের শাসন-শোষণ, বঞ্চনা-নিপীড়নের শিকার বাঙালি জাতি সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা লাভ করে এবং ২৬শে মার্চের ঘোষণার পর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এ ভাষণ আজ জাতির গর্বের বিষয়। ভাষণটি ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ জাতিসংঘের ইউনেসকোর 'দ্য ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি অব ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার'-এ বিশ্বঐতিহ্য সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ভয়াল কালরাত্রি। এই দিন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালি জাতির ওপর অপারেশন সার্চলাইট নামে ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা পরিচালনা করে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এটি জঘন্যতম ঘটনা– যা জাতিকে দুঃখভারাক্রান্ত করে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতি চরম ঘৃণার উদ্রেক করে।

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। নানা আয়োজনে ২০২২ সালের ২৬শে মার্চ শেষ হচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরব্যাপী অনুষ্ঠান। ৭ই মার্চ, ২৫শে মার্চ, ২৬শে মার্চ নিয়ে *সচিত্র বাংলাদেশ* মার্চ ২০২২ সংখ্যায় রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে, নারীর সমান অধিকারের জন্য সারা বিশ্বে পালন করা হয় এই দিনটি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি উপলক্ষে বলেন, 'এদেশের নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেমন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, তেমনিভাবে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলাও সম্ভব হবে।'

১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য– 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার সকল শিশুর সমান অধিকার'। জাতীয় শিশু দিবসকে উপলক্ষ্য করে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

এছাড়া গল্প, কবিতা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য নিয়মিত আয়োজন নিয়ে সাজানো হয়েছে এবারের সংখ্যাটি। আশা করি, পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৯৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সাক্ষাৎকার

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে? ৪
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বদেশ ১০
প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষ

মহাকালজয়ী মহানায়কের শুভ জন্মদিন ১৫
মোনায়েম সরকার

বঙ্গবন্ধু: ভালোবাসার শৈশব, ভালোবাসার শিক্ষা ১৭
প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ ও দুঃখী মানুষের হাসি ২০
প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

বাঙালি সংস্কৃতি: রবীন্দ্রনাথ থেকে শেখ মুজিব ২৪
কালী রঞ্জন বর্মণ

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার আলোয় আজকের বাংলাদেশ ২৮
ফারুক নওয়াজ

বঙ্গবন্ধুই প্রথম শিশুনীতি প্রণয়ন করেছিলেন ৩০
মাহবুব রেজা

প্রধানমন্ত্রীর উপহার শতভাগ বিদ্যুৎ ৩২
মোতাহার হোসেন

ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা ৩৪
প্রত্যয় জসীম

বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক ৩৭
কে সি বি তপু

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৪০
মোহাম্মদ শাহজাহান

গুজব প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা ৪২
মো. মামুন অর রশিদ

সরকারের অর্জন নারীর ক্ষমতায়ন ৪৪
আফরোজা তালুকদার

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ: ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের আশ্রয় ৪৬
নাজনীন সুলতানা নীতি

বঙ্গবন্ধু সেলের দুজন কারারক্ষীর সাক্ষাৎকার ৪৮
কে জী এম ফারুক

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ ও নারী ৪৯
আনোয়ারা আজাদ

দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল বাংলাদেশ ৫০
জাহানারা বেগম

গল্প
বাবা আমার বিজয় ফুল ৫১
সুজন বড়ুয়া

কবিতাগুচ্ছ ৫৯-৬৩
শেখ সালাহ্উদ্দীন, লিলি হক, সোহরাব পাশা, প্রণব মজুমদার, মোহাম্মদ আজহারুল হক, আ. শ. ম. বাবর আলী, মিয়াজান কবীর, দেলওয়ার বিন রশিদ, অজিতা মিত্র, খান চমন-ই-এলাহি, দেবকী মল্লিক, এম হাবীবুল্লাহ, আবীর আহাম্মদ উল্যাহ, আতিক আজিজ, ইমরুল ইউসুফ, মো. ইউনুছ আলী, জয়জিৎ দত্ত, শামসুল আলম টুকু, সাবিত্রী রানী

বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৬৪
প্রধানমন্ত্রী ৬৫
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬৬
আন্তর্জাতিক ৬৬
উন্নয়ন ৬৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৬৭
শিল্প-বাণিজ্য ৬৮
শিক্ষা ৬৮
বিনিয়োগ ৬৯
নারী ৭০
সামাজিক নিরাপত্তা ৭০
কৃষি ৭১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৭১
স্বাস্থ্যকথা ৭২
নিরাপদ সড়ক ৭২
বিদ্যুৎ ৭৩
যোগাযোগ ৭৪
কর্মসংস্থান ৭৪
সংস্কৃতি ৭৫
চলচ্চিত্র ৭৬
মাদক প্রতিরোধ ৭৬
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৭৭
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৭৭
প্রতিবন্ধী ৭৮
ক্রীড়া ৭৯
শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে কাজী রোজী ৮০

হাইলাইটস

মার্চ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় মাস। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চের জাতক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের উন্মেষ পর্ব থেকে শুরু করে ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের করণীয় বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম ও বিজয়ের ছিলেন মহানায়ক।

১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। বঙ্গবন্ধুর জন্ম, শৈশবকাল, শিক্ষাজীবন এবং সমগ্র জীবন ছিল আদর্শ ও অনুকরণীয়। তাঁর সমগ্র জীবনকাল দেশ ও দেশের জনগণের জন্য ভেবেছেন, অন্যায় ও জুলুম-শোষণের বিরুদ্ধে লড়েছেন।

১৯৭১ সালের মার্চের শুরুতেই উত্তাল হয়ে ওঠে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক ন্যায্য অধিকার আদায়ে তাঁর দূরদর্শী বক্তব্যে সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে ১৯৭১ সালের ২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। সারা ঢাকা শহরের ঘরে ঘরে এ পতাকা উত্তোলিত হয়। ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া কোথাও পাকিস্তানি পতাকা দেখা যায়নি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে নৃশংসতম গণহত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। এই মাসে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬শে মার্চও এই মাসে। স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় অর্জনই বাঙালির সবচেয়ে গৌরবের অর্জন। বাঙালির স্বাধীনভূমি 'বাংলাদেশ' এসেছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে। ইতিহাসে মার্চ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধু, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে 'মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?', 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বদেশ', 'মহাকালজয়ী মহানায়কের শুভ জন্মদিন', 'বঙ্গবন্ধু: ভালোবাসার শৈশব, ভালোবাসার শিক্ষা', 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ ও দুঃখী মানুষের হাসি', 'বাঙালি সংস্কৃতি: রবীন্দ্রনাথ থেকে শেখ মুজিব', 'বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার আলোয় আজকের বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধুই প্রথম শিশুনীতি প্রণয়ন করেছিলেন', 'ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা', 'বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক', 'বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা', '১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ: ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের আশ্রয়' শীর্ষক প্রবন্ধ/নিবন্ধ দেখুন যথাক্রমে ৪, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ২৪, ২৮, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪০ ও ৪৬ পৃষ্ঠা

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে?

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধুর ন্যায় মুক্তমনা, উদার ও স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নে প্রোজ্জ্বল একজন অবিসংবাদিত নেতা বাঙালি জাতি পেয়েছিল বলেই পৃথিবীর মানচিত্রে আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অবস্থান নিশ্চিত হয়েছে। বাঙালি জাতি পেয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়। বঙ্গবন্ধুর জীবনাকৃতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় সংক্ষিপ্ত ৫৫ বছরের জীবনে কতটা চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। বাঙালির মুক্তির এই মহানায়কের মস্তিষ্ক ও শিরাধমনীতে সর্বদা প্রবাহিত ছিল স্বাধীনতার চিরন্তন দীপ্তি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের শেষ প্রান্তে এসে বঙ্গবন্ধুর জীবনভর মুক্তি ও সত্যের আন্দোলন ও অনুসন্ধানের প্রতি আমাদের অন্তহীন বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। শিরোনামে উদ্ধৃত একশত এগারো বৎসর পূর্বে রচিত রবীন্দ্র পঙ্‌ক্তি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অনুসন্ধান, আন্দোলন ও অর্জনের যথাযথ প্রতিফলন।

জীবনের শৈশব, কৈশোর, যৌবনের পুরোটা সময় সকল মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধুর যে অতুলনীয় ঔদার্যময় চিন্তাশীলতা ও কর্মকুশলতা আমরা লক্ষ করি, তাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে তিনি ছিলেন মানব মুক্তির অগ্রদূত।

মানব মুক্তির পথ পরিক্রমায় সদা ব্যাপৃত বঙ্গবন্ধুর ৩০৫৩ দিনের কারাজীবনের অতি অল্পই প্রকাশ পেয়েছে বঙ্গবন্ধু রচিত *কারাগারের রোজনামচা* নামক ২০১৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত গ্রন্থে। কিন্তু পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক আমলের পুরোটা সময় তিনি কীভাবে শাসকদের নজরবন্দিতে ছিলেন তার প্রমাণ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার নথিপত্র থেকে প্রকাশিত *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman* নামক গ্রন্থে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা টেলর অ্যান্ড ফ্রান্সিস এই মূল্যবান দলিলের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা লন্ডনে অনুষ্ঠিত এ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বলেছেন যে, বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানিদের সংগৃহীত সকল তথ্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে।

বাঙালির প্রধান মিত্র হওয়ার কারণেই তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঔপনিবেশিক শাসকেরা পাকিস্তানের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ও মুক্ত মানুষ হিসেবে প্রাপ্য সকল মৌলিক অধিকার থেকেও দশকের পর দশক তাঁকে বঞ্চিত রাখে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়া চীন* গ্রন্থত্রয় পাঠ করলে পাঠকেরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, একশত এগারো বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কেন লিখেছিলেন ‘মুক্ত করো হে মুক্ত করো আমারে’।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম রবীন্দ্র জন্মোৎসবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, ‘রক্ত দিয়ে আমরা রবীন্দ্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ ও অপরিমেয় ত্যাগের বিনিময়ে। কিন্তু সত্য, শ্রেয়, ন্যায় ও স্বজাত্যের যে চেতনা বাঙালি কবিগুরুর কাছ থেকে লাভ করেছে আমাদের স্বাধিকার সংগ্রামে তারও অবদান অনেকখানি। বাঙালির সংগ্রাম আজ সার্থক হয়েছে, বাঙালি তার বুকের রক্ত দিয়ে রবীন্দ্র অধিকারকে বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। (*দৈনিক বাংলা*, ৮ই মে ১৯৭২)

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম বাণী ছিল :

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই–
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

১২ই জানুয়ারি ১৯৭২ অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের পরপরই বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধির প্রশ্ন– 'স্যার, আজকের দিনে জাতিকে আপনি কী বাণী শুনাবেন?'

জবাবে বঙ্গবন্ধু তাঁর চোখে-মুখে স্বভাবসুলভ উদার হাসি মাখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করেন (*ইত্তেফাক*, ১৩ই জানুয়ারি ১৯৭২) রবীন্দ্রনাথের ১১৪ বৎসর পূর্বে রচিত 'সুপ্রভাত' কবিতাটির একাংশ যা উপরে উদ্ধৃত। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের প্রভাতক্ষণে 'সুপ্রভাত' কবিতার মাধ্যমে জাতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অভয় বাণী গভীর তাৎপর্যবহ। অধিকারহীন, বঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের মুক্তি ও স্বার্থরক্ষায় বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়স থেকেই যে অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ও *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থদ্বয়ের পাতায় পাতায়।

১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে কতিপয় শর্তাধীনে বহিষ্কার করা হয় কিন্তু আপোশহীনতার প্রতিজ্ঞায় সুদৃঢ় মনোভাবাপন্ন শেখ মুজিব সেদিন আর পেছনে ফিরে তাকাননি। ইতিহাসের কী অদ্ভুত মিল যে, একাত্তরের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছিলেন আচার্য হিসেবে। ২০১০ সালের ১৪ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সিন্ডিকেট ৬১ বৎসর পূর্বে গৃহীত বহিষ্কারাদেশের এ অন্যায় সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কমুক্ত করে।

ইউনেসকো মহাপরিচালকের ঘোষণা সনদ

১১ই নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনেসকোর প্যারিস সদর দপ্তরে ৪১তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর নামে গত বছর প্রবর্তিত 'ইউনেসকো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক সৃজনশীল অর্থনীতি পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে বিশ্বের আর্থসামাজিক-বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদান ও আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার্থে এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ইউনেসকোর মহাপরিচালক অদ্রে আজুলে উপস্থিত ছিলেন যেখানে প্রথমবার এ পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করে উগান্ডার কাম্পালায় অবস্থিত এম ও আই টি ভি ক্রিয়েটিভ লিমিটেড যারা ইতোমধ্যে ৭০০ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে ও ১০০টি ব্যাবসার সম্প্রসারিত বাজার সৃষ্টি করেছে। যুব প্রজন্মের শিক্ষা, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি তার সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে ইউনেসকো জানিয়েছে।

ভাষা হচ্ছে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, প্রশাসনসহ সকল ক্ষেত্রের মূল চালিকাশক্তি। মায়ের ভাষাতেই আমরা খুঁজে পাই জীবন-জীবিকার প্রাণশক্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরপরই গভর্নর জেনারেল জিন্নাহর অযৌক্তিক ঘোষণার কারণেই ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানিরা বাংলা ভাষার গুরুত্ব অস্বীকার করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে অধ্যয়নরত তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্বে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের এই অদ্ভুত কাঠামোতে আর যাই হোক বাঙালির মুক্তি সম্ভব নয়। বাঙালির মুক্তির জন্য প্রয়োজন তাদের স্বাধীন মাতৃভূমি।'

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৬ই মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ।' (*দৈনিক বাংলা*, ৭ই মে ১৯৭২)

পৃথিবীর প্রতিটি মাতৃভাষাই যে গুরুত্বপূর্ণ সেই বোধটি এসেছে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে। ইউনেসকোর সাধারণ অধিবেশনে ১৯৯৯ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে সমগ্র বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

গত বছর ১১ই ডিসেম্বর ইউনেসকোর ২১০তম নির্বাহী বোর্ডের সভায় 'ইউনেসকো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক সৃজনশীল অর্থনীতি পুরস্কার' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুজিব শতবর্ষের এই সময়ে বিশ্ব সংস্থা কর্তৃক তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এ পুরস্কার ঘোষণা বিশ্বের যুবসমাজকে দারুণভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকীতে ইউনেসকো মহাপরিচালক অদ্রে আজুলে যে বাণী দিয়েছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন সর্বদাই অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁর ভাষায়, 'It is certain that Bangabandhu's legacy will continue to be a great source of inspiration for generations to come and for those working to reinvent the world. The UNESCO shares this aspiration for an inclusive, equitable, and democratic society– a dream that Bangabandhu presented on March 7, 1971 in a historic speech now inscribed on UNESCO Memory of the World International Register.'

ইতঃপূর্বে ইউনেসকোর ১০ম মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঘোষণা করেন যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্য স্মারক তালিকায় (Memory of the World International Register) সংযোজিত হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে বিশ্ব সভ্যতার ঐতিহ্য স্মারক তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে ইউনেসকো।

মানবসভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সহজে অভিগম্য করার লক্ষ্যে ইউনেসকো এই কর্মসূচি গ্রহণ করে।

আন্তর্জাতিক সাময়িকী *নিউজউইক* কর্তৃক 'রাজনীতির কবি' বলে অভিহিত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির মহাকাব্য। রাজনীতির লক্ষ্য যদি হয় জনগণের কল্যাণ, তাহলে স্বাধীনতা অর্জন ও সমুন্নত রাখাই হবে জনকল্যাণের সর্বোচ্চ ধাপ। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মূলত বাঙালি জাতির মুক্তির মহাকাব্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্তপর্বে ৭ই মার্চের এই ভাষণ

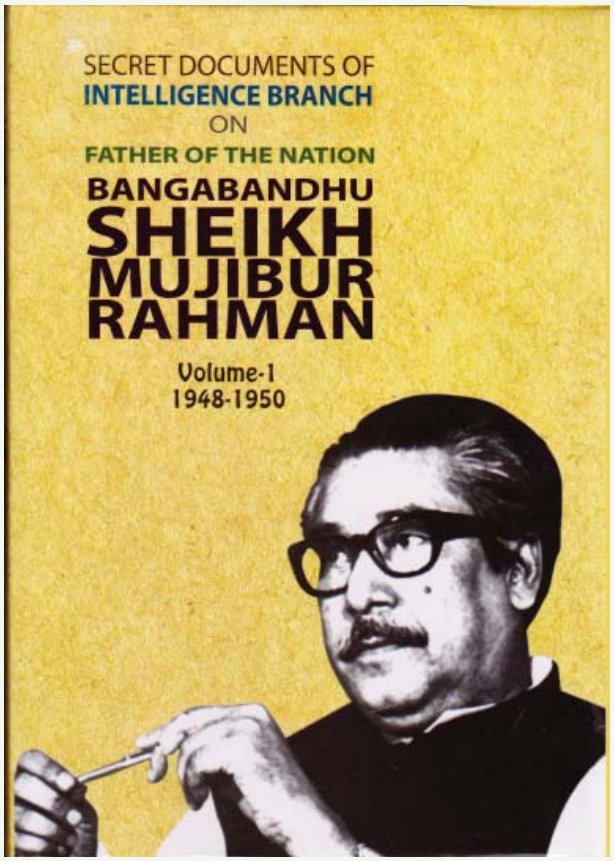

গোটা জাতিকে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। জাতির পিতার এই সম্মোহনী ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্রই ছিল ৭ই মার্চের এই অনন্যসাধারণ ভাষণ।'

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে মানব মুক্তির চিরন্তন সত্যটি জোরালোভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং অন্ধকারকে পেছনে ফেলে আলোর পথে যাত্রার গতিপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের বিশ্ব প্রাসঙ্গিকতা চিরদিন থাকবে কারণ বাঙালির মুক্তি তথা মানব মুক্তি একটি শাশ্বত সত্য যার ওপর ভিত্তি করে মানবসভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে।

ইতিহাসবিদ ও লেখক জ্যাকব এফ ফিল্ড সম্পাদিত *We Shall Fight On The Beaches* গ্রন্থে পুরো পৃথিবীকে আন্দোলিত করেছে এমন ৪১টি ভাষণের মাঝে স্থান করে নিয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১ সাল থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাসে যে ভাষণসমূহ মানবসভ্যতায় স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে, কালজয়ী অনুপ্রেরণাদায়ী সে ভাষণগুলোই এ গ্রন্থের আধেয়।

একটি ভাষণ যে কত শক্তিশালী হতে পারে, নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তর করতে পারে ও পরাধীন বাঙালিকে স্বাধীন জাতিসত্তা দিতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ। সাতই মার্চের রেসকোর্স ময়দানের চিত্র উত্থাপন করে পরবর্তী দিন আটই মার্চ তারিখের *দৈনিক ইত্তেফাকে* 'উত্তাল-উদ্দাম জলধিতরঙ্গ' শিরোনামে লেখা হয়– '৭ মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অনন্যসাধারণ এই দিনের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান। অবিস্মরণীয় এই অনন্যদিনের রেসকোর্সে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নির্দেশকামী স্বাধিকার সৈনিকদের সংগ্রামী সম্মেলন। সংগ্রামী বাংলা দুর্জয় দুর্বিনীত।'

অধুনালুপ্ত *দৈনিক পাকিস্তান* 'লক্ষ কণ্ঠের বজ্রশপথ' শিরোনামে পরদিনের (৮ই মার্চ ১৯৭১) পত্রিকায় বর্ণনা করে– 'লক্ষ হস্তে শপথের বজ্রমুষ্টি মুহুর্মুহু উত্থিত হচ্ছে আকাশে। জাগ্রত বীর বাঙালির সার্বিক সংগ্রামের প্রত্যয়ের প্রতীক, সাত কোটি মানুষের সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রতীক বাঁশের লাঠি মুহুর্মুহু স্লোগানের সাথে সাথে উত্থিত হচ্ছে আকাশের দিকে। এই ছিল রবিবারের (৭ই মার্চ ১৯৭১) রমনার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সভার দৃশ্য।'

'জয় জনতার জয়' শিরোনামে *দৈনিক ইত্তেফাক* পরদিন অর্থাৎ ৮ই মার্চ ১৯৭১ তারিখে রিপোর্ট করে যে গভীর রাত্রিতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, 'সামরিক কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত ঢাকা বেতার হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ প্রচারের অনুমতি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সোমবার (৮ই মার্চ ১৯৭১) সকাল সাড়ে ৮ ঘটিকায়, ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে শেখ মুজিবুর রহমানের রমনা রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ প্রচার করা হইবে। বাংলার অন্যান্য বেতার কেন্দ্র হইতেও ইহা রিলে করা হইবে।' ভাষণটি বাঙালি জাতির মুক্তি প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সেই মুহূর্ত থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিগণিত।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও হত্যাকাণ্ডের দোসররা দীর্ঘ একুশ বছর বঙ্গবন্ধুর এই সম্মোহনী ভাষণটিকে একদিনের জন্যও প্রচার করেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রথমবারের মতো এই ভাষণ সম্প্রচার করে।

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ একাত্তরের অপরাহ্নে যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন বেতার-টেলিভিশন বন্ধ করার যে ঘটনা ঘটিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকেরা, ঠিক তেমনই ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। ৮ই মার্চ ১৯৭১ তারিখের সংখ্যায় অধুনালুপ্ত *দৈনিক আজাদ* 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র নীরব' শিরোনামে নিম্নোক্ত সংবাদ পরিবেশন করে– 'ঢাকা বেতার কেন্দ্র গতকাল রবিবার সহসা স্তব্ধ হইয়া যায়। অপরাহ্ন ৩টা ১৫ মিনিট হইতে এই কেন্দ্র আর কোন অনুষ্ঠান প্রচার করে নাই। কবে আবার এই কেন্দ্র চালু হইবে– সংশ্লিষ্ট কোন মহলই গতকাল তাহা জানাইতে পারে নাই।'

"গতকাল বেতারে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ প্রচারের কথা ছিল। তদানুযায়ী ব্যবস্থাও করা হয়। বঙ্গবন্ধু যখন রেসকোর্সে বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এই গানটি প্রচার করা হয়। কিন্তু নেতার বক্তৃতা শুরু হওয়ার পর নাকি একটি মহল ইহা রিলে করিতে বাধা দেয়। অতঃপর, রেসকোর্স ময়দান হইতেই শেখ মুজিবুর রহমান বেতারের বাঙালি কর্মচারীদের অসহযোগ শুরু করার আহ্বান জানান। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ত্যাগ করিয়া রাস্তায় নামিয়া আসে এবং বেতারও স্তব্ধ হইয়া যায়।" (*আজাদ*, ৮ই মার্চ ১৯৭১) ভাষণটি বাঙালি জাতির মুক্তি প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সেই মুহূর্ত থেকেই বিশ্বব্যাপী পরিগণিত। রবীন্দ্রনাথকে পাকিস্তানিরা ভয় করত বলেই তারা এদেশে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করেছিল।

ঐদিন অর্থাৎ ৭ই মার্চ (১৯৭১) সন্ধ্যায় ঢাকায় অবস্থানরত গণঐক্য আন্দোলনের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'শেখ মুজিবের গৃহীত সকল ব্যবস্থাই যুক্তিসংগত এবং সংখ্যাগুরু প্রতিনিধির বৃহত্তম দলের প্রধান হিসাবে শেখ মুজিবের দেশকে শাসন করার ন্যায্য অধিকার রহিয়াছে।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে এই অনন্যতম ভাষণের ভূমিকা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ভাষণটি আজ আমাদের পবিত্র সংবিধানের অংশ।

৭ই মার্চের ভাষণঃ বঙ্গবন্ধুর 'মুক্তির মহাকাব্যের' যোগাযোগ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আজ থেকে অর্ধশতক বছর পূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত একাত্তরের ৭ই মার্চের ভাষণ যোগাযোগ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক প্রয়োগের এক বিস্ময়কর ঘটনা। যোগাযোগ বিষয়ে আধুনিক নিয়মকানুনের এক আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটেছে এ ঐতিহাসিক ভাষণে।

প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু প্রায় ১৯ মিনিটে এ কালজয়ী ভাষণটি শেষ করেছিলেন। সম্প্রচারতত্ত্বে প্রতি মিনিটে ৬০ শব্দের উচ্চারণ একটি আদর্শ হিসাব। একহাজার একশত সাতটি শব্দের এ ভাষণে কোনো বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি নেই, কোনো বাহুল্য নেই – আছে শুধু সারকথা, সারমর্ম। তবে দু-একটি স্থানে পুনরাবৃত্তি বক্তব্যের অন্তর্লীন তাৎপর্যকে বেগবান করেছে।

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Department of Films and Publications

(Institution)

Dhaka (Town) — *Bangladesh* (Country)

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

30 October 2017 (Date)

Irina Bokova
Director-General, UNESCO

ভাষণের সূচনাপর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে– 'There is nothing like a good beginning for a speech'। বক্তব্যের প্রারম্ভে শ্রোতার মানসিক অবস্থান (audience orientation) ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক বলে যোগাযোগতত্ত্বে যা বলা হয় (reference to audience and reference to recent happenings) তার আশ্চর্য প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধুর এ যুগান্তকারী ভাষণে।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' অত্যন্ত কার্যকর বক্তৃতার অবতরণিকা, যা পুরো বক্তৃতার মূলভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতাকুলকে অভ্যুদিত বক্তৃতার আভাস দিচ্ছে।

পুরো বক্তৃতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও মূলসূত্র ৭ই মার্চের এ বক্তৃতা। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এ বক্তৃতা ছিল আমাদের সিংহনাদ বা যুদ্ধস্লোগান। শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেত এ বক্তৃতা শ্রবণে। বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে বক্তৃতা সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শুধু ঐক্যবদ্ধই করেনি, মাত্র আঠারো দিন পর তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। কারণ, এ ভাষণই ছিল কার্যত (de facto) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না'– বঙ্গবন্ধুর এই উচ্চারণ প্রসঙ্গে প্রয়াত সাংবাদিক-সম্পাদক কামাল লোহানী বলেছিলেন, 'সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার এই বলিষ্ঠতা একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই দেখাতে পেরেছিলেন বলে তিনি জাতিরাষ্ট্র-স্রষ্টা এবং মুক্তিদাতা হিসেবে মহত্ত্ব অর্জন করেছিলেন।'

জনযোগাযোগে যেসব speech-idiom ব্যবহার করার কথা তা অত্যন্ত সঠিকভাবে সুপ্রযুক্ত হয়েছে বক্তৃতায়। বাংলাদেশের জন্মের প্রাক্কালে বাংলার জনগণের সাথে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতার সংলাপ এ বক্তৃতা। প্রাঞ্জল কথোপকথনের ভঙ্গিমায় অতি সহজ সাবলীল ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে রচিত এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার মূল দলিল। শ্রোতাকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সংলাপের বাচনশৈলী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সরাসরি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি: কী অন্যায় করেছিলাম? কী পেলাম আমরা? কীসের আর.টি.সি.? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব?

বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধ সৃষ্টিতে 'ask question and then answer' পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। পুরো ভাষণে বর্তমানকালের যৌক্তিক ব্যবহার বক্তৃতাটিকে সজীবতা দিয়েছে। আবার কথোপকথনের ধারার স্বার্থে তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এ বক্তৃতায়।

বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। বহু গবেষণার পর যোগাযোগ তাত্ত্বিকদের declarative বাক্য সংক্ষিপ্ত করার বর্তমান নির্দেশিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যথাযথ প্রতিফলিত। ভাষণ থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন– '২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন'; 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো'; 'সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে'; 'যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল– কেউ দেবে না'; 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'।

রাষ্ট্রনায়কোচিত ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক বক্তৃতার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভবিষ্যৎ কর্মোদ্যোগ, কর্মপরিকল্পনার সাথে শ্রোতাদের শুধু পরিচিতি করানোই নয়, বরং তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। বঙ্গবন্ধু কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সাধন করেছিলেন তাঁর এ বক্তৃতার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধুর প্রোৎসাহমূলক বক্তব্য– 'তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু– আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' সাড়ে সাত কোটি বাঙালি এ বক্তব্যকেই হুকুমনামারও অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাদেশ বলে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন।

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণের সময়ও তাঁর মানবিক উদারতার কোনো হেরফের কখনও যে ঘটেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ৭ই মার্চের ভাষণ। রাষ্ট্রের জন্ম-মৃত্যুর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েও তিনি 'আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো' বলার সাথে সাথেই আবার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেন– 'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপরে গুলি চালাবার চেষ্টা করো না।' কঠিনের সাথে কোমলের এমন সহাবস্থান উদার-হৃদয় বঙ্গবন্ধুর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল।

যথাযথ তথ্য চয়নের ফলে বক্তৃতাটি অত্যন্ত তথ্যনিষ্ঠ হয়েছে, আর তীক্ষ্ম যুক্তিবিন্যাসের কারণে শ্রোতাদের মাঝে তীব্র প্রণোদনা সঞ্চারে সক্ষম হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়– 'আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু– আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।' সহজ ভাষায় এ ধরনের জোরালো যুক্তিবাদ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এক সহজাত বিশেষত্ব। বক্তব্যের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে সূচনা বক্তব্যের সম্প্রসারণ বা পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয় যোগাযোগবিজ্ঞানে। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে আশ্চর্যজনকভাবে এ দিকটিও প্রতিভাসিত যখন তিনি বক্তৃতার মাঝামাঝি এসে বলেন, 'তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপরে, আমার মানুষের বুকের উপরে গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।'

অন্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে যেয়ে বঙ্গবন্ধু 'put up the attribution first'-এর নিয়মনীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন। বক্তার নাম প্রথম উল্লেখ করে তারপর তার মন্তব্য/বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। যেমন– 'ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না' কিংবা 'ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন। তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম' ইত্যাদি। সার্বজনীন ভাষণের একটি প্রধান দায়িত্ব কর্মসূচি নির্ধারণ (agenda setting function) যা বঙ্গবন্ধুর এ বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে বার বার। কিন্তু কঠোর কর্মসূচি প্রদানকালেও বঙ্গবন্ধুর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির (humanistic approach) যে কোনো তারতম্য ঘটত না– তার স্বাক্ষর নিম্নোক্ত বক্তব্য : 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে– শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না।'

জনযোগাযোগে ব্যক্তি বা ঘটনার মর্যাদা আরোপণ (status conferral function) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার বিভিন্ন অংশে এ বিধানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন তিনি বলেছেন, 'আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন' কিংবা 'আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।'

সার্বজনীন বক্তব্যে ও জনযোগাযোগে কার্যকর ফল লাভের জন্য চ্যালেঞ্জ উত্থাপন (posing a challenge) সর্বজনবিদিত একটি পদ্ধতি। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে যখন বলেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইন্‌শাল্লাহ'– তখন বোঝা যায় যে তিনি যোগাযোগবিদ্যার শিল্পকুশল প্রণালীতে পরম দক্ষতায় কীভাবে শ্রোতাদের বক্তৃতার সাথে গেঁথে ফেলেছেন।

যে-কোনো বক্তৃতার সংজ্ঞানির্ধারণী অংশ সাধারণত শেষেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যোগাযোগবিদদের আধুনিক অভিমত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের শেষবাক্য– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয়ে ব্যক্ত স্বাধীনতার কার্যত ঘোষণা, যা ৭ই মার্চের বক্তৃতার সংজ্ঞা হিসেবে স্বীকৃত। যে প্রক্রিয়ায় তিনি ভাষণ শেষ করেছেন তা যোগাযোগবিদ্যার পাঠ্যপুস্তকের সাথে হুবহু মিলে যায়, যেখানে বলা হয় 'Don't drag out your conclusion'। আমরা প্রায়ই 'পরিশেষে বলছি', 'একটি কথা বলেই শেষ করছি' বা 'পরিশেষে এ কথাটি না বললেই নয়' ইত্যাদি ভূমিকা করে বক্তব্য শেষ করি, কিন্তু এই ঐতিহাসিক

ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি speech definition-এ প্রবেশ করেছেন, যা আধুনিক তত্ত্বের যথাযথ প্রয়োগ এবং যা ছিল পঞ্চাশ বছর পূর্বে অকল্পনীয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (১৮৪৭-১৯৬৫) ১৯৪০ সালের ৪ঠা জুন তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, 'We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender'। এখানে 'we shall fight' ছিল বক্তৃতার সংজ্ঞা।

একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-১৯৬৮) ১৯৬৩ সালের ২৮শে আগস্ট যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সংজ্ঞা অংশ ছিল 'I have a dream'। উক্ত বক্তৃতার একটি অংশ ছিল নিম্নরূপ: 'I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal, I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character'.

যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের (১৮০৯-১৮৬৫) ১৮৬৩ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রদত্ত গেটিসবার্গ বক্তৃতায় '...and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth' কিংবা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর (১৮৮৯-১৯৬৪) ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ই আগস্ট মধ্যরাতে প্রদত্ত ভাষণের 'A tryst with destiny' একইভাবে বক্তৃতায় সংজ্ঞা নির্ধারণ করে।

আমরা জানি যে, বলিষ্ঠ বক্তব্য সর্বদাই সংক্ষিপ্ত হয়। একাত্তরের ৭ই মার্চ তারিখে প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তট-অতিক্রমী ভাষণ তেজস্বী বক্তৃতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। একটি ভাষণ একটি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কী দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল– তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের দিক নির্দেশনা ও স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ কণ্ঠস্বর সংবলিত এ ভাষণের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সময়োপযোগিতা বিশ্লেষণ গবেষকদের জন্য এক স্বর্ণখনি। এ ভাষণ বাঙালিকে যেভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত ও দীক্ষিত করেছিল, তা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছে নতুন এক বক্তৃতা আলেখ্য। সার্বজনিক বক্তৃতাবিশারদ, গবেষক ও যোগাযোগবিদদের জন্য এ ঐতিহাসিক ভাষণ আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে দেশ-বিদেশে। আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনা ও আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিশীলিত ও স্বচ্ছ উপস্থাপনা সার্বজনিক সম্ভাষণ বা Public Address-এ অন্যতম শর্ত।

এ প্রসঙ্গে ডেল কার্নেগীর উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'The best argument is that which seems merely an explanation' অর্থাৎ সর্বোত্তম যুক্তি হচ্ছে শুধুই সঠিক ব্যাখ্যা। তৎসময়ের ঘটনাবলির আনুপূর্বিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এ ভাষণটিকে সব সময়ের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক অভিভাষণ বঙ্গবন্ধুর extempore speech হলেও লক্ষণীয় যে, উপস্থিত বক্তৃতার সচরাচর পরিদৃষ্ট লক্ষণ যেমন বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি, শব্দচয়নে মুহূর্তের দ্বিধাগ্রস্ততা ইত্যাদি ছিল একেবারেই অনুপস্থিত। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোনো টীকা বা নোট ব্যতিরেকে এমন নির্মেদ ও নির্দেশনামূলক ও একই সাথে কাব্যময় বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব বিধায় আন্তর্জাতিক সাময়িকী *নিউজউইক* তখনই বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল একাত্তরের ৫ই এপ্রিলে প্রকাশিত তাদের প্রচ্ছদ নিবন্ধে। এ বক্তৃতা আক্ষরিক অর্থেই ছিল একটি বিপ্লব, যার ফল আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। শব্দের এমন সুপ্রযুক্ত ব্যবহার সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতায় শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) বিখ্যাত উক্তি 'the most valuable of all talents is that of never using two words when one will do' আমাদের স্মরণে আসে। ৭ই মার্চ একাত্তরের এ ভাষণ বাংলা ভাষায় শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষণ নয়, পৃথিবীর একটি অন্যতম ভাষণ। কারণ এ ভাষণ আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা। এ ভাষণ যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উজ্জীবিত রাখবে, জীবনসত্য অনুধাবনে পথ দেখাবে ও বাঙালির সার্বিক মুক্তি আন্দোলনকে দেবে রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা।

সেলিনা হোসেনের মতে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব, সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন।' বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখাবে।

রবীন্দ্রনাথের শতাধিক বছর পূর্বে মুক্তির অনুসন্ধানে রচিত যে রবীন্দ্র পঙ্‌ক্তি এ প্রবন্ধের শিরোনামের পর উদ্ধৃত করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু মানবজাতির সেই সার্বিক মুক্তির ঠিকানা দিয়ে গেছেন ৭ই মার্চের ভাষণে। তাই ইউনেসকো আজ বিশ্ব ঐতিহ্য স্মারক তালিকায় বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণকে সংযোজিত করে মানব মুক্তির চলমান যাত্রাকে আরও গতিশীল করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের এসময়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সর্বাঙ্গীন মুক্ত সমাজ গঠনে আসুন আমরা সংকল্পবদ্ধ হই।

বঙ্গবন্ধুর নিম্নোক্ত মূল্যবান উদ্ধৃতি উল্লেখ করে আমি জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি–

> একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে। (বঙ্গবন্ধু, ৩০শে মে ১৯৭৩)

তথ্য নির্দেশিকা

১. ইউনেসকো ওয়েবসাইট

২. *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ রাজনীতির মহাকাব্য*, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা, ২০১৭

৩. *মুক্তির সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৮

৪. তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকী

৫. *We Shall Fight On The Beaches (ed),* Jacob F Field, Michael O' Mara Books Limited, London, 2013

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক: সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বদেশ

প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষ

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান নামের কৃত্রিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতা বিষয়ে পূর্ববঙ্গ কেন্দ্রিক বাঙালি জনগোষ্ঠীর মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে। অধিকাংশ মানুষই বুঝে যায়, স্বাধীনতার নামে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের বন্দিত্বের শিকারে নতুন রূপে আটকা পড়েছে। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জনগোষ্ঠীর এই ভাবনা ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। এই প্রেক্ষাপটেই বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভাব ঘটে তখনকার তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের। সাতাশ-আটাশ বছরের তরুণ শেখ মুজিব তখনই বুঝেছিলেন বাংলাদেশ পরাধীন হয়ে পড়েছে পাকিস্তানিদের কাছে এবং তখন থেকেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ব্যক্ত করেছিলেন এই কথা, 'সেই জন্য আমার দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। ভেঙ্গে ফেলে সব নতুন করে গড়তে হবে। নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেশনে গিয়েছি, আমি জাম্প করতে চাই না। আমি জাম্প করবার মানুষ নই। আমি স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখি ১৯৪৭-৪৮ সালে। কিন্তু আমি ২৭ বছর পর্যন্ত স্টেপ বাই স্টেপ মুভ করেছি।'[১]

১৯৪৭-এর পর দীর্ঘ দুই যুগের নিরন্তর সাধনায়, অনেক ত্যাগ-সংগ্রাম-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ অর্জন করে আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর প্রাথমিক স্বপ্ন পূরণ হলো, কিন্তু তাঁর মূল স্বপ্ন সোনার বাংলা তখনো অধরা। স্বপ্নের সেই সোনার বাংলাকে নির্মাণের জন্য এবার শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর নতুন যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে নেমে বঙ্গবন্ধু দেখলেন সোনার বাংলা গড়ার জন্য চারদিকের পরিস্থিতি বিরূপ। পাকিস্তানিরা ধ্বংস করে দিয়েছে দেশের সবকিছু, রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য, সর্বত্রই একটা নাজুক পরিস্থিতি। কিন্তু কোনোকিছুতেই তো দমবার পাত্র নন বিদ্রোহী রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই সাতচল্লিশ থেকেই তো তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। স্বাধীনতা এসেছে, এবার তাকে অর্থবহ করে তুলতেই হবে। তাই যে ১৩১৪ দিন তিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন, তাঁর প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তকেই তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছেন স্বপ্নের স্বদেশ গড়ার কাজে।

প্রায় তিন দশকের রাজনৈতিক জীবনে বহু আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই সংগ্রামের পরিক্রমার একটু একটু করে ধাপে ধাপে রূপ নিয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ। বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের কর্মসূচির উদ্‌বোধন এবং এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু যে দুটি ভাষণ দিয়েছেন, সেই ভাষণদ্বয় থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার একটা রূপরেখা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার বাংলার ধারণাকে বঙ্গবন্ধু দিতে চেয়েছিলেন বাস্তব রূপ। এজন্য তিনি প্রথমেই নজর দিয়েছিলেন বাংলাদেশের কৃষিসম্পদের দিকে। কৃষির উন্নয়নকেই তিনি বাংলাদেশের উন্নতির মাপকাঠি হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন। সনাতন কৃষি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বঙ্গবন্ধু সমবায় প্রথা চালুর ডাক দিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, 'সমাজের পরিবর্তন চাই। ... সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই। যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের, সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে। ... যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, তাতে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ... পাঁচ বছরের প্ল্যানে বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে একটি করে কো-অপারেটিভ হবে। ... এর জমি মালিকের থাকবে। কিন্তু তার ফসলের অংশ সবাই পাবে। প্রত্যেকটি বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে-মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে এই কো-অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলে এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচ শত থেকে এক হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে। আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।'[২]

বঙ্গবন্ধু শোষিত মানুষের মুক্তি কামনা করেছেন, তাদের জন্য সারা জীবন লড়াই করেছেন, প্রত্যাশা করেছেন দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক শোষিতের গণতন্ত্র। তিনি গণতন্ত্র প্রত্যাশা করেছেন, কিন্তু সে গণতন্ত্র শোষকের নয়, শোষিতের। শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন বলে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে তিনি সংযোজন করেছেন সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধুর ছিল স্বতন্ত্র ভাবনা। খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে গণপরিষদের অধিবেশনে

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। ... আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে– শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো– শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কী আবহাওয়া, কী ধরনের অবস্থা, কী ধরনের মনোভাব, কী ধরনের আর্থিক অবস্থা, সব কিছু বিবেচনা করে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে...। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা নয় মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয়, দুনিয়ার কোনো দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে, তারাও সেগুলি করতে পারেন নাই। এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি।'[৩]

আন্তরিকভাবে সমাজতন্ত্র প্রত্যাশা করতেন বলে বঙ্গবন্ধু বার বার শোষিতের কথা বলতেন এবং সে উদ্দেশ্যেই গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রথা চালুর কথা বলেছেন। নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলে বন্দি গণতন্ত্র মুক্তি পেত, মুক্তি পেত শোষিত মানুষ। কিন্তু পঁচাত্তরের মধ্য আগস্টে তাঁকে হত্যা করে শোষিত মানুষের মুক্তির সেই স্বপ্নযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর ছেচল্লিশ বছর পরেও একথা আমাদের বলতে হচ্ছে– বঙ্গবন্ধু শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য যে পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ সে পথে অগ্রসর হয়নি। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর এই বিশ্লেষণ, 'পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডটি যদি না ঘটত এবং বঙ্গবন্ধু তাঁর বাকশাল শাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারতেন, তাহলে বাংলাদেশের অবস্থা আজ কী দাঁড়াত, সে সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু চিন্তাভাবনার দরকার আছে। বাকশাল পদ্ধতি সফল হলেই বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হতো, এমন দাবি করি না; বাংলাদেশে সুবিধাভোগী শ্রেণির গণতন্ত্রে কিছুটা ছাঁটকাট হয়েছিল বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটি তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছত। ব্রিটিশ আমলের আমলাতন্ত্রের হাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বন্দি ছিল। নির্বাচিত জেলা গভর্নর প্রথা সেই বন্দি অবস্থা থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করত। এ জন্যই এই গণতন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল শোষিতের গণতন্ত্র।'[৪]

গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র– দুই বিপ্রতীপ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বঙ্গবন্ধু মিলাতে চেয়েছেন অভিন্ন মোহনায়। তাঁর মতে এই মিলনটাই হতে পারে শোষিত মানুষের মুক্তির একমাত্র দার্শনিক ভিত্তি। গণতন্ত্র সকল মানুষের সমতার কথা বলে না, কাগজে-কলমে থাকলেও সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের সুযোগ বাস্তবে তেমন দৃশ্যগোচর নয় গণতন্ত্রে। অপরদিকে, সমাজতন্ত্রে অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে ক্রমে গৌণ হয়ে পড়েছে রাজনীতি– বঙ্গবন্ধু একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রাজনীতি গৌণ হয়ে গেলে ক্রমে দেখা দেয় সরকারি আমলাতন্ত্রের দাপট, যা শোষিতের গণতন্ত্রের পথে হয়ে দাঁড়ায় প্রধান অন্তরায়। সম্ভাব্য এই রাজনৈতিক সংকটের কথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই তিনি গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মিলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা করতে চেয়েছেন রাষ্ট্র এবং এভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন স্বপ্নের স্বদেশ। কিন্তু লেখার অপেক্ষা রাখে না, আমরা এখন বঙ্গবন্ধুর এই একান্ত স্বকীয় রাজনৈতিক দর্শন থেকে অনেক দূরে– রাজনীতি এখন হয়ে পড়েছে অনেকটাই গৌণ। সরকারি আমলাতন্ত্র প্রাধান্য পেলে, ধর্নাঢ্য ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠলে– রাজনীতি ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সেই কত আগে একথা বলেছেন বিশ্বখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে চাইলে এদিকে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। প্রত্যাশিত স্বদেশ গড়তে হলে প্রশাসনিক কাঠামো আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিপ্লব সফল করার জন্য এদিকে নজর দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি প্রায়শই বলতেন, 'প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দরকার।'[৫] ঔপনিবেশিক প্রশাসন দিয়ে যে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না– একথা বঙ্গবন্ধু যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'যে কোনো কারণেই হোক, ইংরেজ যে শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল, সেটা শাসন বা শোষণ করবার জন্যই কায়েম করেছিল। কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেলাম, আমাদের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। বহুদিন পর্যন্ত পুরোনো আমলের মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করেছি। ... আপনারা যাঁরা বহুদিন যাবৎ এ দেশের শাসনের সাথে বা প্রশাসনের সাথে জড়িত আছেন, তাঁরা দেখেছেন– অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন, কাজের মাধ্যমে দেখেছেন যে, জনগণ থেকে আমাদের শাসনকাঠামো অনেকটা বিচ্ছিন্ন, প্রকৃত যোগাযোগ তাদের সাথে ততটা নাই।'[৬] দেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো আমূল পালটে দিতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ সৃষ্টির জন্য তিনি যেতে চেয়েছেন নতুন শাসন পদ্ধতিতে। নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন :

> আজকে যে সিস্টেমটা করা হয়েছে, সেটা নতুন। পার্লামেন্টের মেম্বাররা বা সংসদ সদস্যরা লোক্যালি শাসন পরিচালনা করেন, এমন নজির দুনিয়ার ইতিহাসে নাই। এই পদ্ধতিতে অ্যাপয়েন্টেড গভর্নর, অ্যাপয়েন্টেড ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এমনি অনেক কিছুই আমরা এখানে দিয়েছি যা অন্য কোথাও নাই। এটা একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট। ... গভর্নরশিপের যে ক্ষমতা আমরা আইনে দিয়েছি, তা কম নয়। আমরা সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে জেলার কানেকশন রাখতে চাই। তেমনি সরাসরি জেলার সাথে থানার, থানার সাথে ইউনিয়নের কানেকশন রাখতে হবে। ... যে ক্ষমতা আইনে গভর্নরদের দেয়া হয়েছে, তা আগে একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও ভোগ করেন নাই। তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা আপনাদের দেয়া হয়েছে। আপনাদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার সাথে সাথে কাউন্সিল করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পার্টি থাকবে। পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন, আপনার চেয়ে তাঁর ক্ষমতা কোন অংশে কম থাকবে না। একদিকে আপনি যেমন রেসপনসিবল ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তেমনি পার্টির যিনি সেক্রেটারি থাকবেন তিনি রেসপনসিবল সমস্ত পার্টির জন্য। যখন গভর্নর সাহেব কাউন্সিল মিটিং কল করবেন, তখন নিশ্চয়ই সেক্রেটারি সেখানে উপস্থিত হবেন। আবার, যখন সেক্রেটারি সাহেব পার্টি মিটিং কল করবেন, তখন গভর্নর সাহেব তাঁর সামনে বসবেন।[৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন। এক্ষেত্রে পার্টি ও প্রশাসনের মধ্যে তিনি প্রত্যাশা করেছেন প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সম্পর্ক। বঙ্গবন্ধুর এই ভাবনা-উত্তরকালে সেভাবে গুরুত্ব পায়নি, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে প্রায়শই বলতেন– আমরা এ দেশের শাসক নই, আমরা এ দেশের

সেবক। জনগণ থেকে শাসনকাঠামোকে তিনি কখনো বিচ্ছিন্ন করে ভাবতে চাননি। নতুন এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করবে গভর্নরসহ জেলা প্রশাসনের উপর। শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রশাসনের সকলের উদ্দেশে বলেছেন, 'আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব থাকে, কুটুম্বসাক্ষাৎ থাকে। বড়ো ভীষণ ব্যাপার। যদি আপনারা এ সমস্ত জিনিসের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারেন, তাহলে যে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার কী অবস্থা হবে, তা বলতে, তা ভাবতে আমার ভয় হয়। আপনাদের স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। ... স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করবার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।'[৮] দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ছিল কঠোর অবস্থান। দুর্নীতিই যে সামাজিক উন্নতির পথে বড়ো অন্তরায়, জেলা গভর্নরদের তা তিনি বিশদভাবে বলেছেন। নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা সফল করতে হলে প্রশাসনকে অবশ্যই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের জন্য তিনি বলেন,

> বড়ো জিনিস হলো, একটা লাস্ট কথা, যেটা আমি বারবার বলি করাপ্‌শন। আমি আমার সহকর্মীদের ভেতর থেকে যাদের দিচ্ছি এবং এ পর্যন্ত যাদের আমি গভর্নর করেছি, তাঁদের প্রতি সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে, সকলের প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, তারা করাপ্‌শনের ঊর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু শুধু নিজেরা ঘুষ খাওয়াই করাপ্‌শন নয়। এ সম্বন্ধে আমার কথা হলো করাপ্ট পিপলকে সাহায্য করাও করাপ্‌শন। নেপোটিজমও কিন্তু এ টাইপ অব করাপ্‌শন। স্বজনপ্রীতিও কিন্তু করাপ্‌শন। আপনারা এসব বন্ধ করুন। ... স্বজনপ্রীতি ছেড়ে দিলে আপনারা করাপ্‌শন বন্ধ করতে পারবেন। যাঁরা থানা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে রয়েছেন, তাঁরা সেখানে করাপ্‌শন বন্ধ করবেন। ... স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটা লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না। আমি এর প্রতিকার দেখতে চাই। ... আপনারা ইচ্ছা করলে নিজের নিজের এরিয়ার মধ্যে করাপ্‌শন বন্ধ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা পারবেন। অন্য কাজ করুন বা না করুন, এটা করবেন। দুর্নীতি যেন আর না থাকে।[৯]

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যদ্বয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু স্বজনপ্রীতি আর দুর্নীতিকেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বশান্তির অতন্দ্র সৈনিক। কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়, সকলের সঙ্গে মৈত্রীই ছিল বঙ্গবন্ধুর বৈদেশিক নীতির মূল দর্শন। দেশকে গড়ে তোলার জন্য তিনি সকল দেশের সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাশা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর এই বৈদেশিক নীতি বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। তিনি কোনো জোটবদ্ধ হতে চাননি, থাকতে চেয়েছেন জোটনিরপেক্ষ বলয়ে, শোষিত মানুষের দলে। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত আলজিয়ার্সের জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'[১০] ১৯৭৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তাঁর এই শান্তিদর্শন ও বৈদেশিক নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন এই কথা, 'আমরা নন-এলায়েন্ড, আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরেন পলিসিতে বিশ্বাস করি, আমরা পিসফুল কো-এক্সিসটেন্স-এ বিশ্বাস করি। আমরা দুনিয়ার নির্যাতিত পিপলের সাথে আছি, আমরা কারো সাথে শত্রুতা করতে চাই না। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমরা আন্ডার ডেভেলপড্ কান্ট্রি, আমরা বিশ্বে শান্তি চাই। আমরা কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমাদের ব্যাপারেও

কেউ হস্তক্ষেপ করুক, এটা আমরা চাই না। ... ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে আমাদের প্রয়োজন নাই। ... যেখানে কোনো অপ্রেসড ইন্টারন্যাশনাল পিপল থাকবে, আমরা তাদের মর‍্যাল সমর্থন দিতে পারি এবং দেব। আমরাও অপ্রেসড পিপল।'[১১] বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের এই বৈদেশিক নীতি বিপথগামী হয়ে পড়েছিল, বাংলাদেশ ঝুঁকে পড়েছিল বঙ্গবন্ধুর দর্শনের বিপ্রতীপ মেরুতে। কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার শাসনামলে এক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। বাংলাদেশ এখন প্রকৃত প্রস্তাবেই শান্তিপ্রিয় দর্শন এবং স্বাধীন বৈদেশিক নীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সকলের সঙ্গেই আছে আমাদের শান্তিময় সম্পর্ক। সন্দেহ নেই, বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরেই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা মৌল সমস্যার দিকে নজর দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। রাজনীতি এবং আমলাতন্ত্রের মধ্যকার বিরোধ তিনি লক্ষ করেছেন। এই বিরোধের ফলে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাষ্ট্র এবং সাধারণ মানুষ। তাই অতিসূক্ষ্ম রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে তিনি প্রত্যাশা করেছেন রাজনীতি এবং আমলাতন্ত্রের সুসমন্বয় এবং সুসঙ্গতি। তিনি নতুন রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষা দিয়ে কামনা করেছেন রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের যৌথ সাধনার মাধ্যমেই গড়ে উঠতে পারে প্রত্যাশার বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের জুনে দ্বিতীয় বিপ্লবের মৌল দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আর একটা জিনিস আমি মার্ক করলাম। সেটা হলো এই যে, একদল বলে আমরা পলিটিশিয়ান, একদল বলে আমরা ব্যুরোক্রেট। তাদের অ্যাটিচিউট হলো হাউ টু ডিসক্রেডিট দি পলিটিশিয়ান। পলিটিশিয়ানরা তাদের স্ট্রেংথ দেখাবার জন্য বলতো যে, অল রাইট, গেট আউট। এই নিয়ে সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকতো। এই সন্দেহটা দূর করা দরকার। এবং দূর করে– সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালোবাসে এবং মঙ্গল চায়, এটা প্রমাণ করতে হবে।'[১২]

স্বপ্নের সোনার বাংলা করার জন্য বঙ্গবন্ধু সমবায় প্রথার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বহুমুখী সমবায় প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। জেলা গভর্নরদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। এটা সোজাসুজি বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মালটিপারপাস কো-অপারেটিভ।'[১৩] সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি ও সমবায়ের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছেন শোষিত বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের মুক্তি, প্রত্যাশা করেছেন সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল থেকে পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি। বঙ্গবন্ধু প্রত্যাশা করেছেন ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। উনিশশো পঁচাত্তরের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় লক্ষ মানুষের সামনে তিনি ঘোষণা করেন এ কথাই, যা ইতঃপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।[১৪]

বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের স্বদেশ গড়ার জন্য মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করেছেন শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। দেশের মানুষ যথার্থ শিক্ষা লাভ করে সোনার মানুষ হয়ে উঠুক– এমনটাই কামনা করেছেন বঙ্গবন্ধু। শিক্ষাকে বঙ্গবন্ধু দেখেছেন মানবিক প্রযুক্তি হিসেবে। দেশের মানুষকে যথার্থ শিক্ষা দিতে হলে এ খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দের কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ-স্কুল শিক্ষকের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে। ৫ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্যে একটা 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্যে মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।'[১৫] বঙ্গবন্ধুর উপর্যুক্ত ভাবনা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারলে তাঁকে এক শিক্ষা-দার্শনিক হিসেবেও শনাক্ত করা যাবে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য তিনি নতুন ও পরিকল্পিত শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছেন। তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে শিক্ষিত মানুষ হবে মানবিক মানুষ। যে শিক্ষা কেবল কেরানি আর আমলা সৃষ্টি করে, সে শিক্ষা বঙ্গবন্ধু চাননি। তিনি চেয়েছেন দেশপ্রেমিক মানবিক মানুষ হওয়ার শিক্ষা। এ জন্য তিনি শিক্ষার জগৎ থেকে রাজনীতিকে দূর করতে চেয়েছেন– তিনি বলেছেন মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশ ছাড়া কখনোই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায় না।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। চীনের শান্তিসম্মেলনে তিনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেছেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তিনি বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২) গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন : 'আমি বাংলায় বক্তৃতা করলাম। আতাউর রহমান সাহেব ইংরেজি করে দিলেন। ... কেন বাংলায় বক্তৃতা করব না। ... পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছেন মাতৃভাষার জন্য। ... আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারি। তবু আমার মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য।'[১৬] শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা বাংলার উপর বঙ্গবন্ধু বিশেষ জোর দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর অতি অল্প সময়ে বাংলা ভাষায় সংবিধান রচনা করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পালন করেন ঐতিহাসিক ভূমিকা। আদালতের রায় বাংলা ভাষায় লেখার নির্দেশ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন না হবার কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ১৯৭৫ সালের ১২ই মার্চ রাষ্ট্রপতির সচিবালয় থেকে জারি করা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিম্নোক্ত পরিপত্র :

> গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বাংলা আমাদের জাতীয় ভাষা। তবুও অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, স্বাধীনতার তিন বৎসর পরেও অধিকাংশ অফিস-আদালতে মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ইংরেজী ভাষায় নথিপত্র লেখা হচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি যাঁর ভালবাসা নেই দেশের প্রতি যে তাঁর ভালবাসা আছে এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ তিন বৎসর অপেক্ষার পরও বাংলাদেশের বাঙালী কর্মচারীরা ইংরেজী ভাষায় নথিতে লিখবেন সেটা অসহনীয়। এ সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী নির্দেশ সত্ত্বেও এ ধরনের অনিয়ম চলছে। আর এ উশৃঙ্খলতা চলতে দেয়া যেতে পারে না।
>
> এ আদেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারী,

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা সরকারী অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমে নথিপত্র ও চিঠিপত্র লেখা হবে। এ বিষয়ে কোন অন্যথা হলে উক্ত বিধি লংঘনকারীকে আইনানুগ শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হবে। বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্তাব্যক্তিগণ সতর্কতার সাথে এ আদেশ কার্যকরী করবেন এবং আদেশ লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করবেন। তবে বিদেশী সংস্থা বা সরকারের সাথে পত্রযোগাযোগ করার সময় বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী কিংবা সংশ্লিষ্ট ভাষায় একটি প্রতিলিপি পাঠানো প্রয়োজন। তেমনিভাবে বিদেশের কোন সরকার বা সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদনের সময় বাংলার সাথে সাথে অনুবাদিত ইংরেজী বা সংশ্লিষ্ট ভাষায় প্রতিলিপি ব্যবহার করা চলবে।[১৭]

বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের স্বদেশে মাতৃভাষা বাংলা প্রচলনে কতটা এবং কোন মাত্রায় আগ্রহী ছিলেন, উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। কিন্তু ১৯৭৫ সালে তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর অন্য অনেক কিছুর মতো সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনেও দেখা দিলো রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধকতা। বাংলাকে সেসময়ে স্বদেশে পরবাসী বানানো হয়েছিল– যার ধারা এখনো আমরা বহন করে চলেছি। বর্তমান সরকারের আমলে এক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এখনো সে পরিবর্তন প্রত্যাশিত মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন এখনো একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধ আচরণ দেখে আতঙ্কিত হতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ– তা সরকারি বা বেসরকারি হোক বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে-পরে লেগেছে। বাংলাচর্চা সেখানে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এমন বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেননি বঙ্গবন্ধু। মাতৃভাষা বাংলা যাতে সুষ্ঠুভাবে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পায়, তার উদ্যোগ নিতে হবে। একথা অনুধাবন করতে হবে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা না পেলে, সে শিক্ষা কখনোই পূর্ণতা পায় না।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সুষম বণ্টনভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক মানবিক বাংলাদেশের। তাঁর স্বপ্নের স্বদেশে গণতান্ত্রিক-রাজনৈতিক-সংস্কৃতির বিকাশ প্রত্যাশা করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রত্যাশার বাংলাদেশে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সে উদ্দেশ্যে সংবিধানে গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে।

দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে। সকলের মিলিত সাধনা দিয়ে তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন স্বপ্নের স্বদেশ। সেই স্বদেশ নির্মাণ হোক এখন আমাদের অন্বিষ্ট বিষয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই স্বদেশ কীভাবে অর্জিত হতে পারে, তাঁর পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন এভাবে : 'লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার...। আই ক্রিয়েটেড এ ফ্যামিলি হোয়েন আই অরগ্যানাইজড্ আওয়ামী লীগ। ... আর পলিটিক্যাল পার্টি মিন্স এ ফ্যামিলি, যার মধ্যে আছে আইডিওলজিক্যাল এফিলিটি। সেজন্য পার্টিতে উই আর ওয়ান ফর সাম পার্টিকুলার পারপাসেস, হোয়্যারেভার উই আর। আমাদের আদর্শ হলো– বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ইজ্জত সহকারে দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখা, বাংলার দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাবার দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা, যেখানে অত্যাচার অবিচার জুলুম থাকবে না, দুর্নীতি থাকবে না। লেট আস অল ট্রাই ফর দ্যাট'।[১৮]

স্পষ্টত বোঝা যায়, স্বপ্নের স্বদেশ গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনীতি আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক, বিকাশ ঘটুক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির, শোষিতের গণতন্ত্র মুক্তি পাক– এভাবেই গড়ে উঠুক স্বপ্নের মানবিক বাংলাদেশ– এই-ই হোক এখন আমাদের আত্যন্তিক অঙ্গীকার।

তথ্য নির্দেশিকা

১. বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। দ্রষ্টব্য : এ কে আব্দুল মোমেন (সম্পাদক), ২০২০, *শেখ মুজিবুর রহমান : ভাষণ সমগ্র* (১৯৫৫-১৯৭৫), ঢাকা, চারুলিপি, পৃ. ৫৮০

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৫

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬

৪. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ২০২১, 'পনেরো আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডটি যদি সংঘটিত না হতো', বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত *সূর্যকরোজ্জ্বল শেখ মুজিব* শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ, সিরাজগঞ্জ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, পৃ. ৪৮

৫. দ্রষ্টব্য : এ কে আব্দুল মোমেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৯

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৯

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬০-৫৬১

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭-৫৬৮

১০. দ্রষ্টব্য : বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০২১, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, ঢাকা : ধী প্রকাশ, পৃ. ১৪

১১. দ্রষ্টব্য : এ কে আব্দুল মোমেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৫

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২

১৬. শেখ মুজিবুর রহমান, ২০২০, *আমার দেখা নয়াচীন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ২২৮

১৭. দ্রষ্টব্য : রতনলাল চক্রবর্তী (সম্পাদক), ২০০০, *ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬

১৮. দ্রষ্টব্য : এ কে আব্দুল মোমেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৪ [২০২০]

প্রফেসর বিশ্বজিৎ ঘোষ: গবেষক, লেখক ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

জীবদ্দশায় শেষ জন্মদিনে গণভবনে শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু (১৭ই মার্চ ১৯৭৫)

মহাকালজয়ী মহানায়কের শুভ জন্মদিন

মোনায়েম সরকার

১৭ই মার্চ বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভ জন্মদিন। বাংলার মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতার জন্মদিন ঘিরে দেশে-বিদেশে নানামুখী কর্মকাণ্ড গৃহীত হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনিভাবে সম্মানিত হচ্ছে উদীয়মান বাংলাদেশের গণমুখী কার্যক্রম। যে মহামানবের জন্ম না হলে বাংলাদেশ পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারত না, তাঁকে ঘিরে একটু অন্যরকম আনন্দোৎসব হবে– এটাই স্বাভাবিক। বঙ্গবন্ধুর মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে বাঙালি জাতিও সম্মানিত হয়। কেননা বঙ্গবন্ধুর লড়াই-সংগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাঙালির জীবনমান উন্নতকরণ। নিপীড়িত বাঙালির ত্রাতা হিসেবে জননায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের আপোশহীন নেতৃত্ব চিরদিন বাঙালি জাতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। পঁচাত্তর-পরবর্তী দীর্ঘ একুশ বছর এই পরিচয় চিহ্ন মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নাম কোনো দিনই মুছে যাওয়ার নয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্‌যাপন ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য আনন্দঘন উৎসবে পরিণত হচ্ছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে মৌখিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করার প্রস্তাব উত্থাপন করি। আমার প্রস্তাব ছিল ২০১৯ সালের ১৭ই মার্চ থেকে ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ পর্যন্ত বছরব্যাপী জন্মোৎসব পালন। কিছুদিন পরে প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর নিজের কিছু পরিকল্পনা যুক্ত করে তিনি এটাকে ২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। এর ফলে দুটো সুবিধা হয়েছে, একটি হলো– সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন, অন্যটি হলো– স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যে চিন্তা থেকে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছেন এবং যে সময় তিনি নির্ধারণ করেছেন (২০২০-২০২১) তা যথার্থই হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ২০১৮ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আমরা একটু আগে থেকেই এই চিন্তা করেছিলাম বলে বেশকিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করতে পেরেছি। বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন একটি ছোট্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠান হলেও এর কর্মকাণ্ড আজ আর ছোটো করে দেখার অবকাশ নেই। মুজিববর্ষ ঘিরে আমরা বিশটির মতো বই প্রকাশ করেছি, মৌলিক দুটি কালজয়ী গান নির্মাণ করেছি এবং দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে পোস্টার, লিফলেট প্রকাশ করেছি। শুধু বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনই নয়, এরকম আরও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান মহাসমারোহে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। আমরা চেয়েছিলাম, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে দেশে-বিদেশে শিশুকিশোরদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা গেঁথে দিতে, বর্তমান সরকার সে বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক বলেই মনে হয়েছে।

শেখ মুজিব আজ শুধু আর বঙ্গবন্ধু নন, তিনি এখন বিশ্ববন্ধু। তাঁর চিন্তা-চেতনা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা পৃথিবীর মানুষকে চমকিত করেছে, তাঁর মতো সাহসী ও আপোশহীন নেতা শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এ কারণেই বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা যেমন UNO, UNESCO বঙ্গবন্ধুকে সম্মানিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ১২টি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। UNESCO বঙ্গবন্ধুর নামে শান্তিপদকও ঘোষণা করেছে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– 'বিশ্ব দুই শিবিরে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত– আমি শোষিতের দলে।' আমৃত্যু বঙ্গবন্ধু শোষিত মানুষের পক্ষেই লড়াই করে গেছেন। এ কারণেই তিনি বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিককে যুক্ত করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। আজকের বিশ্বব্যবস্থায় 'শোষিতের গণতন্ত্র'ই নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে, বঙ্গবন্ধু অনেক আগেই একথা ভেবেছিলেন। এজন্যই তিনি 'শোষিতের গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারলে বাংলা সত্যিকার অর্থেই সোনার বাংলা হয়ে উঠত। ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুকে সেই সুযোগ না দিয়ে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে পা দিয়ে সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। এর ফলে পিছিয়ে পড়ে

বাংলাদেশ, মুখ থুবড়ে পড়ে বঙ্গবন্ধুর আজন্মলালিত স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার প্রদর্শিত পথেই নিরলসভাবে হেঁটে চলেছেন। তিনি দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশকে সম্মানের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাঁর উন্নয়নমূলক গণমুখী কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে বাংলাদেশ সর্বদিক থেকেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নয় লক্ষ গৃহহীন পরিবারকে গৃহ প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী একটি ঐতিহাসিক কাজ করেছেন। বাংলার মানুষ না খেয়ে থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না, তারা ভাত-কাপড়-বাসস্থান সবকিছুই পাবে, তাদের মুখে একদিন হাসি ফুটবে– এমন স্বপ্নই খেলা করত বঙ্গবন্ধুর চোখে। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে না পারলেও তাঁর কন্যা বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজগুলো নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও ধীরে ধীরে সম্পন্ন করছেন। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে একথা বলাই যায়, লড়াকু বাঙালি জাতিকে আর দাবায়ে রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধুই আমাদের দিশারি। বঙ্গবন্ধুকে অনুসরণ করেই আমরা সৎ হতে পারি, সচেতন হতে পারি, দক্ষ কর্মী ও দেশপ্রেমিক হয়ে দেশকে গড়ে তুলতে পারি। একথা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বঙ্গবন্ধুই আমাদের ঐতিহ্য, বঙ্গবন্ধুই আমাদের ভবিষ্যৎ। বঙ্গবন্ধু আমাদের মঙ্গলের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে যদি আমরা এ দেশে শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি, যদি এ দেশের নিপীড়িত জনগণের জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবেই বঙ্গবন্ধুর আত্মদান সার্থক হবে। আর এ কার্যসাধনে বঙ্গবন্ধুর অমলিন স্মৃতিই হবে আমাদের পথ প্রদর্শক। আজ যদি আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভুলে যাই, তাঁর আদর্শকে বিস্মৃত হই, তবে জাতি হিসেবেই আমাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়বে তাই নয়, পৃথিবীর জন্যও তা এক মহাক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের জন্য প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে সকল বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যই শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় বিষয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম ও শাহাদত দিবস পালনে যুক্ত হয়েছে রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ ও নানামুখী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। আজ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *কারাগারের রোজনামচা* ও *আমার দেখা নয়াচীন*। তাঁর এবং স্বাধীনতার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে নানারকম ভাস্কর্য ও স্মৃতিসৌধ, যেমন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গ্লাসটাওয়ার, শিখা চিরন্তন, শেখ মুজিবের জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি। পঁচাত্তরে মুজিব সমাধির যে চেহারা ছিল আজ তা নেই। তাঁর বাড়ির ভাঙা দরজাও আজ বদলে গেছে। এই ছবিগুলো আছে *হু কিলড মুজিব* আর *বাংলাদেশের সমাজবিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন* গ্রন্থে। ছবিগুলো সেসময় দিল্লিতে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত দিয়েই *হু কিলড মুজিব* গ্রন্থের লেখক এ এল খতিবের (আবদুল লতিফ খতিব) হাতে পৌঁছেছিল। ছবিগুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমারও কিছু ভূমিকা ছিল। কিন্তু আমাদের শুধু এখানেই তৃপ্তির ঢেকুর গিললে হবে না, আরও ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। আমরা আশা করি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সাংস্কৃতিক শুদ্ধতা নিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন।

আজকের সভ্য মানুষ সমঅধিকারে বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি চাচ্ছে শান্তিপূর্ণ সুখী জীবন। একটি শান্তিপূর্ণ জীবন পেলে, সার্বিক নিরাপত্তা পেলে ব্যক্তিমানুষের আর কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না। জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ে প্রগতিকে রোধ করা যায় না। বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, বিশ্ব এগিয়ে যাবে, তবে নতুন বিশ্ব কোন পথে চলবে, নতুন দিনের সমাজতান্ত্রিকদের সেই কথাটাই ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে আবেগকে প্রাধান্য না দিয়ে যুক্তিকেই মূল্য দিতে হবে। পৃথিবী অতীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ, সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে, ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের কাল্পনিক কাব্যকথা শুনতে মানুষ রাজি নয়। পৃথিবীব্যাপী মানুষ আজ একটি (Humane world order) মানবিক বিশ্বব্যবস্থা ও আইনের শাসন কামনা করছে। বঙ্গবন্ধু ঘোষিত শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই গড়ে তোলা সম্ভব হবে আগামী দিনের সুখী, সমৃদ্ধিশালী, সুন্দর পৃথিবী।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাঙ্ক্ষিত মহামানব যখন ধরণির বুকে পদার্পণ করেন, তখন দিকে দিকে রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়, মর্ত্য-ধূলির ঘাসে ঘাসে জাগে প্রাণপ্রবাহ। বাংলার মহাকালজয়ী মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মমুহূর্তেও নতুন করে সেজেছিল বাংলার প্রাণ-প্রকৃতি। তাঁর আবির্ভাবে নিপীড়িত বাংলা পীড়ন থেকে মুক্তি পায়, স্বাধীনতার আনন্দে উদ্ভাসিত হয় বাংলার উর্বর প্রান্তর। যে মহামানবের আপোশহীন সংগ্রাম ও দূরদর্শী নেতৃত্ব বিশ্বের বুকে নতুন পরিচয়ে বাঙালিকে পরিচিত করে, তাঁর শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

মোনায়েম সরকার: রাজনীতিবিদ, লেখক, কলামিস্ট, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ও মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, bfdrms@gmail.com

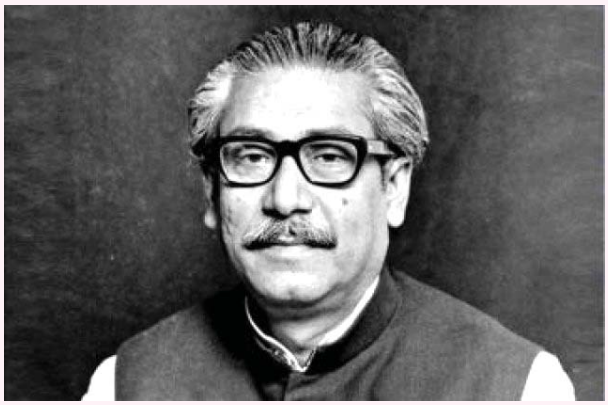

বঙ্গবন্ধু
ভালোবাসার শৈশব, ভালোবাসার শিক্ষা

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান

খুব সুন্দর একটি গ্রাম। ছবির মতো। কিন্তু ছবির তো প্রাণ নেই। ছবির মতো হতে যাবে কেন? খুব প্রাণময় একটি গ্রাম। জীবন ও প্রকৃতির কোলাহলে মুখর। ওই কোলাহল আবার হাটবাজারের কোলাহল নয়– প্রাণের কোলাহল। বাইগার নদীর তীর ঘেঁষে সাজানো সুন্দর এই গ্রাম। নাম টুঙ্গিপাড়া। ওই নদী আবার এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে মধুমতী নদীতে। প্রতিটি গ্রামে, হাটবাজারে, প্রতিটি জনপদে জলের ধারা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের নদীগুলো তার অসংখ্য শাখাপ্রশাখার জাল বিস্তার করে রেখেছে দেশময়। মধুমতীও তার একটি। আর বাইগার হলো তার সেই শাখা নদী যার জলে সিক্ত হয় টুঙ্গিপাড়া গ্রাম, সবুজ-শ্যামলিমায় ভরে ওঠে ফসলের মাঠ, বিস্তীর্ণ জনপদ। আর বিচিত্র বৃক্ষ, বিটপী ও গুল্মের আচ্ছাদনে মায়াময় হয়ে ওঠে টুঙ্গিপাড়া গ্রামের চির শান্তসৌম্য জনপদ। নদীতে হাল ধরা মাঝির ভেসে আসা সুর ও পাখপাখালির মিষ্টি কণ্ঠে মধুময় হয়ে ওঠে এই ছোটো জনপদটির জীবন। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় এই গ্রামটি অবস্থিত। এখন অবশ্য গোপালগঞ্জ জেলা আর টুঙ্গিপাড়া উপজেলা। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাই ১৭ই মার্চ বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মাহেন্দ্রক্ষণ। হাজার বছর ধরে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। অন্যের দ্বারা শাসিত হতে হতে, শোষিত হতে হতে বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ন্যুব্জ হয়ে গিয়েছিল। দাসবৃত্তি ঢুকে পড়েছিল তার মনে ও মননে। বঙ্গবন্ধু এই পরাধীন জাতিকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য এক জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন; আমাদের একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র দিয়ে গেছেন।

এই মানুষটির শৈশব কেমন ছিল? কীভাবে তিনি বেড়ে উঠেছেন? কীভাবে তিনি এমন অসাধারণ মানুষ হতে পারলেন? সেই পারাটা কি কৃত্রিম, ধরে বেঁধে জোর করে তাঁকে এমন মানুষ করা হয়েছে? না। একেবারেই নয়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন আর প্রকৃতির মধ্যে তিনি এতই সহজ-সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছেন যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও কোনো বারণ ছিল না, কোনো নিষেধ ছিল না, কোনো জোর-জবরদস্তি ছিল না। নাম রাখার সময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শেখ মুজিবের নানা শেখ আবদুল মজিদ। মেয়েকে তিনি বলেছেন, 'মা সায়ারা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।'[১] জগৎ জোড়া খ্যাত হয়েছেন তিনি; কিন্তু সেই পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।

আজকে যারা শহরে জন্মগ্রহণ করছে, শহরে বেড়ে উঠছে তাদের মতো শৈশব ছিল না বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধুতনয়া শেখ হাসিনা *শেখ মুজিব আমার পিতা* নামক গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এই ক্ষণজন্মা মানুষটির শৈশব। তিনি লিখেছেন :

> আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধুলোবালি মেখে। বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে। বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। আর তাই গ্রামের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে করে মাঠে-ঘাটে ঘুরে প্রকৃতির সাথে মিশে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগত। ছোট শালিক পাখির ছানা, ময়না পাখির ছানা ধরে তাদের কথা বলা ও শিস দেওয়া শেখাতেন। বানর ও কুকুর পুষতেন, তারা তাঁর কথা মতো যা বলতেন তারা তাই করত। আবার এগুলি দেখাশোনার ভার দিতেন ছোট বোন হেলেনের উপর। এই পোষা পাখি, জীব-জন্তুর প্রতি এতটুকু অবহেলা তিনি সইতে পারতেন না।[২]

প্রকৃতির এই সান্নিধ্য থেকে তিনি কখনোই নিজেকে বঞ্চিত করতে চাননি। তাই জেলখানার অবরুদ্ধ কঠিন জীবনেও তিনি বাগান করতেন, গাছগাছালির পরিচর্যা করে সময় কাটাতে পছন্দ করতেন, পশুপাখি পুষতেন।

প্রকৃতির প্রাণিজগতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। খুব শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে মমত্ববোধ তৈরি হয় পাখির প্রতি, গৃহপালিত প্রাণীদের প্রতি। এদের জীবনযাপন নিয়েও তাঁর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তিনি এদের পুষতেন আর নানারকম খেলাধুলা শেখাতেন। তিনি যা বলতেন কুকুর, বানর তাই করত। এই ছিল তাঁর আনন্দের জগৎ। এদের প্রতি সামান্য অবহেলা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ছোটো বোন যদি অবহেলা করত, তাকে বকতেন। উত্তর জীবনেও তাঁর এই ভালো লাগার জগৎ নিয়ে তিনি কারাগারের নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করতেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা *কোটি মানুষের কণ্ঠস্বরে* লিখেছেন :

> আমি তখন খুব ছোট। আব্বা জেল থেকে আসার সময় একটা বিড়াল নিয়ে এলেন। জেলারকে বলেছিলেন 'এই বিড়াল আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। এটাকে দিয়ে দিন।' জেলার রাজি হলেন। আব্বা তো পশুপাখি, প্রাণী-প্রকৃতি খুব ভালোবাসতেন। ৩২ নম্বর বাড়িতে কত পোষা পশুপাখি ছিল। তখন আমরা থাকি সেগুনবাগিচার বাসায়। আব্বা জেল থেকে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা বিড়াল। আমি সেই বিড়াল পেয়ে কী যে খুশি। মহাখুশি। বিড়ালও আমার পায়ে পায়ে ঘোরে, কোলে কোলে থাকে। ... আব্বা রোজ নাস্তার টেবিলে বলতেন, কবুতরকে খাবার দেওয়া হয়েছে? কুকুর-বিড়ালকে খাবার দেওয়া হয়েছে?

> গরুগুলোকে ঠিকমতো খাবার দিয়েছে? সময় হলে নিজেই বের হয়ে আসতেন। হাতে একটা বাটিতে গমের দানা। মা পাশে থাকতেন, আমরা পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম, রাসেল আব্বার কোলে গিয়ে উঠতো, নিজ হাতে কবুতরকে আদর দিতেন। কবুতরগুলো ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে বসতো তাঁর হাতে।[৩]

শেখ মুজিবুর রহমানের পিতা শেখ লুৎফর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল মানুষ। পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি মাস্টার, পণ্ডিত ও মৌলবি সাহেব রেখেছিলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন কাচারি ঘরের পাশেই। শেখ বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে বয়ে গেছে একটি সরু খাল। এই খালের পাড়েই ছিল বিশাল কাচারি ঘর। খোকার শিশুতোষ শিক্ষা শুরু হয় এই কাচারি ঘরে ওই তিনজন শিক্ষকের কাছে। বলা যায়, এদের কাছেই তাঁর লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। তিনি পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা শিখতেন; কবিতা, গল্প ও ইংরেজি শিখতেন কাজী আবদুল হামিদের কাছে এবং মৌলবি সাহেবের কাছে শিখতেন আরবি ও আমপারা। এরপর তিনি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন তাঁর ছোটো দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ প্রতিষ্ঠিত অঞ্চলের প্রথম ইংরেজি এম ই স্কুলে। গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া স্কুল। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই পড়াশোনা করেন।[৪] শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'একবার বর্ষাকালে নৌকা করে স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকাডুবি হয়ে যায়। আমার আব্বা খালের পানিতে পড়ে যান। এরপর আমার দাদি তাঁকে আর ঐ স্কুলে যেতে দেননি। আর একরত্তি ছেলে, চোখের মণি, গোটা বংশের আদরের দুলাল, তাঁর এতটুকু কষ্ট যেন সকলেরই কষ্ট!'[৫] সুতরাং এ স্কুলে তাঁর আর পড়া হলো না। তিনি চলে গেলেন গোপালগঞ্জ শহরে। গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন শেখ মুজিব। মা সায়ারা খাতুন কখনো তাঁর পিতার সঙ্গে শহরে থাকতেন না। তিনি বলতেন, 'আমার বাবা আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যাতে তাঁর বাড়িতে আমি থাকি। শহরে চলে গেলে ঘরে আলো জ্বলবে না, বাবা অভিশাপ দেবে।'[৬] সুতরাং গোপালগঞ্জে তিনি থাকতেন বাবার সঙ্গে। অবশ্য শৈশবের যে স্মৃতিচারণ তিনি করেছেন, তাতে বাবার সান্নিধ্যই মধুময় হয়ে উঠেছে। বলেছেন, 'আব্বার কাছে থেকেই আমি লেখাপড়া করি। আব্বার কাছেই আমি ঘুমাতাম। তাঁর গলা ধরে রাতে না ঘুমালে আমার ঘুম আসত না। আমি বংশের বড় ছেলে, তাই সমস্ত আদর আমারই ছিল।'[৭] ১৯৩৪ সালে তিনি সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এসময় তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। হঠাৎ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। চিকিৎসার জন্য বাবা তাঁকে কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানে শিবপদ ভট্টাচার্য ও এ কে রায় চৌধুরীর মতো বড়ো বড়ো ডাক্তারদের কাছে তিনি চিকিৎসা নেন। এভাবেই দুই বছর কেটে যায়। ১৯৩৬ সালে তিনি পিতার নতুন কর্মস্থল মাদারীপুরে চলে যান এবং মাদারীপুর হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। অসুস্থতার জন্য মা সায়ারা খাতুনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৩৬ সালেই বেরিবেরি রোগের সঙ্গে তিনি চোখে গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হন এবং কলকাতা গিয়ে ডাক্তার টি. আহমেদের কাছে চিকিৎসা নেন। এসময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান লিখেছেন :

> চোখের চিকিৎসার পর মাদারীপুরে ফিরে এলাম, কোন কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই, শুধু একটামাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। মাদারীপুরের পূর্ণ দাস তখন ইংরেজের আতঙ্ক। স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বোসের দলই শক্তিশালী ছিল। পনের-ষোল বছরের ছেলেদের স্বদেশীরা দলে ভেড়াত। আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপরে কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষ বাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম।[৮]

সুতরাং বোঝা যায় যে, খুব শৈশব থেকেই শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে রাজনীতি মনস্কতা প্রগাঢ়ভাবে উপস্থিত ছিল। সেই থেকে নিয়তির মতো তাঁর জীবনে রাজনীতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবার গোপালগঞ্জ ফিরে এসে তিনি মিশন স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। স্কুল জীবনে বেরিবেরি আর গ্লুকোমায় আক্রান্ত হয়ে প্রায় চার বছর তিনি পড়াশোনা করতে পারেননি।

*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি লিখেছেন, 'ছোট সময় আমি খুব দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম। খেলাধুলা করতাম, গান গাইতাম এবং খুব ভাল ব্রতচারী করতে পারতাম।'[৯] এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল খেলাধুলার প্রতি। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতেন তিনি। প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। বিনয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভালো অবস্থান ছিল।'[১০] মধুমতী নদী পার হয়ে চিতলমারী ও মোল্লারটেক যেতেন ফুটবল খেলতে। গোপালগঞ্জে স্কুলের টিম ছিল। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমানও খেলতে পছন্দ করতেন। তাঁরও একটা টিম ছিল– অফিসার্স ক্লাবের টিম। সেই টিমের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের টিমের খেলা হতো। পিতা-পুত্রের টিমের মধ্যে এই খেলা খুব সাড়া জাগাত এলাকায়। নিজে খেলতেন এবং তাঁর স্কুলের ছেলেরা খেলত– এখানেই তাঁর পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল না। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তিনি লিখেছেন, 'মহকুমায় যারা ভাল খেলোয়াড় ছিল, তাদের এনে ভর্তি করতাম এবং বেতন ফ্রি করে দিতাম।'[১১]

জন্মসূত্রেই তিনি লাভ করেছিলেন মানুষের প্রতি অসাধারণ একটি দরদি হৃদয়। মানুষের দুঃখ, কষ্ট আর অসহায়ত্ব তিনি কখনোই সহ্য করতে পারতেন না। শেখ হাসিনা লিখেছেন :

তিনি ছোটবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকে বিভিন্ন বাড়িতে জায়গির থেকে পড়াশুনা করতো। চার পাঁচ মাইল পথ হেঁটে স্কুলে আসতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেকদূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটা ছিল ব্যাংক পাড়ায় আব্বা তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকে নিয়েই তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি আব্বার জন্য মাসে কয়েকটা ছাতা কিনতে হতো কারণ আর কিছুই নয়। কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে, তাদের ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বইও মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন।[১২]

কখনো দেখা যেত প্রচণ্ড শীতে তিনি শুধু চাদর জড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন। পুত্রের জন্য আমগাছের নিচে অপেক্ষমাণ মা ছেলের এই অবস্থা দেখে অবাক। পরে মা জানলেন দরিদ্র কোনো ছেলেকে পাজামা-পাঞ্জাবি দিয়ে এসেছেন ছেলে। ওই ছেলের পরনের জামাকাপড় একদম ছিঁড়ে গেছে, পরার যোগ্য নয়। শুনে আনন্দে মায়ের চোখ সিক্ত হয়ে ওঠে। কী যে কোমল হৃদয় নিয়ে জন্মেছে ছেলেটি! বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে কখনোবা মুজিব দেখলেন পথের ধারে বসে বৃদ্ধ কোনো ভিক্ষুক প্রচণ্ড ঠান্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে আর কাঁদছে। মুজিবের দরদি মন অস্থির হয়ে ওঠে। তিনি নিজের চাদর খুলে বৃদ্ধের গায়ে জড়িয়ে দেন। মানুষের প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধ চিরকাল তাঁকে পরিচালিত করেছে। কিছুকে বা কাউকে সামান্যতম পরোয়া না করে, নিজের লাভ-ক্ষতির বিন্দুমাত্র হিসাব না করে তিনি এগিয়ে গেছেন সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণের পথে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পেশা– কিছুই তিনি বিবেচনা করেননি। তিনি বিবেচনা করেছেন এ দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা। শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'কৈশোরেই তিনি খুব বেশি অধিকার সচেতন ছিলেন। একবার যুক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা গোপালগঞ্জে সফরে যান এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। সেই সময় সাহসী কিশোর মুজিব তাঁর কাছে স্কুল ঘরে বর্ষার পানি পড়ার অভিযোগ তুলে ধরেন এবং মেরামত করার অঙ্গীকার আদায় করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।'[১৩] এই অধিকার চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে জন্ম নেয় রাজনীতি চেতনা। খুব শৈশব থেকেই তিনি রাজনীতি মনস্ক হয়ে ওঠেন।

শৈশবে তাঁর বিশেষ এই মনোগড়ন তৈরি হওয়ার সেই সংবেদনশীল সময়গুলোতে তিনি যাদের ভালোবাসা, প্রেরণা, সমর্থন এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করেছেন তারা হলেন তাঁর পিতামাতা ও কাছের আত্মীয়স্বজন। বিশেষ করে তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান তাঁর সকল কাজে সমর্থন জুগিয়েছেন। তিনি যখনই অনুভব করেছেন যে, শেখ মুজিব যা করছেন তা দেশের জন্য করছেন, দেশের মানুষের জন্য করছেন, তখন তিনি তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কারও অভিযোগও আমলে নেননি। মা-বাবার এই সহযোগিতা ও সহমর্মিতা তাঁকে বন্ধুর পথ চলতে শক্তি জুগিয়েছে। তিনি আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামমুখর পথ পাড়ি দিতে পেরেছেন।

খুব শৈশব থেকেই তিনি ভালোবাসতে শিখেছিলেন। খেলার সঙ্গীদের তিনি ভালোবাসতেন, সহপাঠীদের ভালোবাসতেন, গরিবদুঃখী মানুষদের ভালোবাসতেন, প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন, নদনদী, খালবিলকে ভালোবাসতেন। জলের সঙ্গে ছিল তাঁর সখ্য। প্রকৃতির সকল পাখপাখালি আর প্রাণিকুলের প্রতি তাঁর ছিল অফুরন্ত মমত্ব। ভালোবাসার এই বিরল মনোগড়ন নিয়ে তিনি বড়ো হয়েছেন। নিজের যতই কষ্ট হোক না কেন অন্যের যেন কষ্ট না হয়– এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যের উপকার করতে তিনি বিন্দুমাত্র পিছপা হতেন না। আর ভালোবাসার দায় থেকেই তিনি এক জীবন জেলে কাটিয়েছেন এ দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য। তাঁর এক জীবন উৎসর্গের বিনিময়ে আমরা লাভ করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

তথ্যসূত্র

১. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা* (আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৫), পৃ. ২৬
২. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৩. শেখ রেহানা, 'আমার বাবা শেখ মুজিব', *কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর*, ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সম্পাদিত (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি ২০২০), পৃ. ৭৯
৪. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা ২০১২), পৃ. ৮
৫. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৭. প্রাগুক্ত।
৮. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
১০. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১১. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১২. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১৩. শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

প্রফেসর ড. সরকার আবদুল মান্নান: সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ, drsharkaramannan@yahoo.com

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বৈষম্যহীন সমাজ ও দুঃখী মানুষের হাসি

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল

বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে। সেদিন পাকিস্তানি শক্তিশালী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে। তখন থেকে পাকিস্তান ও সহযোগী রাষ্ট্ররা প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এদিকে স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি জামাতে ইসলামি, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ, পিডিপিসহ কট্টর মুসলিম ভাবাপন্ন রাজনৈতিক দলগুলো গোপনে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে 'মুসলিম বাংলা' কায়েমের লক্ষ্যে তাদের সর্বশক্তি নিয়ে তৎপরতা চালায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের ধনী ব্যবসায়ী সুবিধাবাদীদের ইন্ধনে উগ্র সমাজতন্ত্রপন্থি নকশালবাহিনী, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র স্লোগানবাদী জাসদ দেশে খুন, হত্যা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিল।

১৯৭১ সালেই ভারতে বসে খোন্দকার মোশতাক মুক্তিযুদ্ধ বানচালের চেষ্টা করেছিল। এমনকি পাকিস্তানিদের সঙ্গে আঁতাত করে ষড়যন্ত্রও করেছিল। কিন্তু তার এ চক্রান্ত ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কাছে ধরা পড়ে, তাই সেসময় মোশতাক কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারেনি। কিন্তু সে থেমেও থাকেনি। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার ইচ্ছা তাকে প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করত। তাই বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একের পর এক গুটি চালাতো। প্রথমেই সে যা করেছিল, তাহলো– বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর সবার আগে গিয়ে দেখা করে নিজেকে বিশ্বাসী প্রমাণ করা এবং তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে কথা বলে তাঁর প্রতি বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ভেঙে দেওয়া। কারণ সে জানত তাজউদ্দীন ও বঙ্গবন্ধু একসঙ্গে থাকলে নিজের স্বার্থ হাসিলের কোনো উপায় থাকবে না। এভাবে সে মন্ত্রিপরিষদে স্থায়ী হয়েছিল। এখান থেকেই চলছিল তার কুকর্ম। খুব সতর্কতার সঙ্গে সে বিভিন্ন কাজ করছিল। শুরু করেছিল আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার, ভারত বিরোধিতা এবং দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যসংকট তৈরির কাজ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশি ও আন্তর্জাতিক বাংলাদেশবিরোধীদের তৎপরতা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মার্কিন দূতাবাসের দায়িত্ব নেয় ইউজিন বোস্টার। দায়িত্ব নিয়ে পরদিনই খোন্দকার মোশতাকের সঙ্গে দেখা করে। এদের যৌথ কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন থেকে। আবার ছাত্রলীগও দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। শফিউল আলম প্রধান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হয়ে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল।

১৯৭২ সালের অক্টোবরে ভারত থেকে দেশে ফিরে মওলানা ভাসানী শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরোধিতা, ১৯৭২ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর আ স ম আব্দুর রব সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ভাষণ দেন। সিরাজ শিকদার নিজের সর্বহারা পার্টি নিয়ে অস্ত্র হাতে নেমে পড়েছিলেন। কর্নেল তাহের বঙ্গবন্ধুর কাজের সবটুকু না বুঝেই সমালোচনা এবং বিরোধিতা শুরু করেছিলেন।

সব মিলিয়ে ১৯৭২ সালেই বঙ্গবন্ধুর জন্য বৈরী পরিবেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এগুলো ছিল প্রকাশ্যে বিরোধিতা। কিন্তু অন্যদিকে আরেকটি দল ভালো মানুষের মুখোশ পরে দেশের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যোগাযোগ রাখছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিবেশ সৃষ্টি করবার। পাকিস্তান, আমেরিকা, চীন এদের ইন্ধন জোগাচ্ছিল। এই দল ছিল আগের দলের চেয়েও ভয়াবহ। এই শত্রুরা মিত্র সেজে ঘুরছিল বঙ্গবন্ধুর চারপাশে।

বাঙালি যে শত্রু হতে পারে বঙ্গবন্ধু ধারণাই করতে পারেননি। তিনি মনে করেছিলেন, এসব বিরোধিতা সাময়িক ব্যাপার। তিনি এও চিন্তা করেছিলেন যে, এ অবস্থা তিনি রুখবেন। কারণ সাধারণ জনগণ তাঁর পক্ষে ছিল। কিছু বিপথগামী মানুষ হইচই করে তাঁর গতি রোধ করতে পারবে না। তাই এই বৈরী পরিবেশেই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়েছিল। সংবিধানের মূলনীতি ছিল– বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। মওলানা ভাসানী এই সংবিধানেরও বিরোধিতা করেছিলেন।

এই অবস্থা সামাল দিতে তিনি বাকশাল গঠনের মাধ্যমে সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চেয়েছিলেন। এর গঠন উপলক্ষে তিনি জাতীয় সংসদে যে ভাষণ দেন, তাতে তাঁর লক্ষ্য সম্পূর্ণ বোঝা যায়। জাতীয় সংসদে ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,

> একটা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম সাড়ে সাত কোটি লোক, ৫৪ হাজার স্কোয়ার মাইল। সম্পদ বলতে কোনো পদার্থ আমাদের ছিল না। সমস্ত কিছু ধ্বংস। ... অর্থনৈতিক কাঠামো নেই। একটা ফরেন অফিস নেই, একটা প্ল্যানিং অফিস নেই। নেই একটা কোনো কিছু। ...কাজ করব না, ফাঁকি দেব। অফিসে যাব না ফাঁকি দেব, ফ্রিস্টাইল। ... তারা এ দেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেল। হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অর্থ আসতে আরম্ভ করল। দেশের মধ্যে শুরু হলো ধ্বংস, একটা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। মোট কয়েক

হাজার কর্মীকে হত্যা করা হলো। যারা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাদেরকে হত্যা করা হল। ... (গণতন্ত্রের সুযোগে) এই রাজনীতির নামে হাইজ্যাক, এই রাজনীতির নামে ডাকাতি, টেলিফোন করে মানুষের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে বা মানুষের বাড়িতে গিয়ে গহনা কেড়ে নেয়। এ রাজনীতির নামে একটা ফ্রিস্টাইল শুরু হয়ে গেল। তাই এ রাজনীতি আমি চাই না, এ গণতন্ত্র আমার মানুষ চায় না। ... এমেন্ডমেন্ড কনস্টিটিউশনে যে নতুন সিস্টেমে আমরা যাচ্ছি তা-ও গণতন্ত্র, শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। ... বহুদিন কারাগারে একলা একলা চিন্তা করেছি, আমার দেশের শতকরা ২০ জন লোক শিক্ষিত, তার মধ্যে এক গ্রুপ পলিটিশিয়ান হয়ে গেলাম। এক গ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। এক গ্রুপ টিচার। এক গ্রুপ সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ী হয়ে গেলাম। কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম। কেউ অমুক হয়ে গেলাম। আমার সমাজে যত জ্ঞানী-গুণী লোক আছে এবং অন্য ধরনের, তাদের নিয়ে জাতীয় পুল করা দরকার। এই পুল আমি করতে পারি যদি আমি একটা নতুন সিস্টেম চালু করতে পারি এবং নতুন দল সৃষ্টি করি জাতীয় দল, যার মধ্যে একমাত্র একপথ একভাবে হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায়। যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে তারা এসে একতাবদ্ধ হয়ে দেশের মঙ্গলের জন্যে কাজ করে যেতে পারে, এজন্যই বাকশাল করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপন করেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে প্রচলিত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বাতিল করে বাকশাল ব্যবস্থা চালু করা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এবং জাতীয় লীগ নিয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট। সব মানুষকে নিয়ে একটি জাতীয় দল গঠন করে বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক তথা দীন-দুঃখী মেহনতি শোষিত মানুষের সার্বিক মুক্তি চেয়েছিলেন তিনি। একে তিনি 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বা 'শোষিতের গণতন্ত্র' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এর লক্ষ্য ছিল প্রথমত– বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান নরনারী ও ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানে এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি, মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিলোপসাধন, কৃষক ও শ্রমিকসহ মেহনতি ও অনগ্রসর জনগণের ওপর শোষণ অবসানের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষিব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও ক্রমিক যান্ত্রিকীকরণ এবং সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান, বিপ্লবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখী সর্বজনীনসুলভ গঠনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-স্বাস্থ্যরক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের মৌলিক সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, বিচার ব্যবস্থার কালোপযোগী জনকল্যাণকর পরিবর্তন সাধন এবং গণজীবনের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদকরণ।

দ্বিতীয়ত– বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

এর উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী শোষকদের প্রতারণামূলক গণতান্ত্রিক শাসন এবং শোষণের অবসান ঘটিয়ে শোষণহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং এই জাতীয় সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু সবাইকে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সময় কিছু পত্রিকাও দেশবিরোধী মিথ্যা সংবাদ প্রচারে লিপ্ত ছিল, সেসব পত্রিকা বন্ধ করে গণতান্ত্রিকমনা পত্রিকাগুলো চালু থাকে। যেমন এখনও বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে কিছু পত্রিকা একই জাতীয় অপরাধে বন্ধ থাকে।

বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবে প্রাথমিক যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনলেন, তাহলো– বাধ্যতামূলক সমবায় সমিতি। এতে বলা হয়, প্রতিটি গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে জমি চাষ করবে। চাষের উপকরণ দেবে সরকার। উৎপাদিত ফসল তিন ভাগ হবে– এক ভাগ পাবে জমির মালিক, এক ভাগ চাষে নিয়োজিত শ্রমিকরা এবং আরেক ভাগ সরকার। কিন্তু তাঁর এ পদ্ধতির সুফল জনগণকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে ষড়যন্ত্রকারীরা।

বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামো একেবারে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনায় গ্রামকেই প্রশাসনিক ও উৎপাদন ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা চালু হলে সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতো। বঙ্গবন্ধু তাঁর

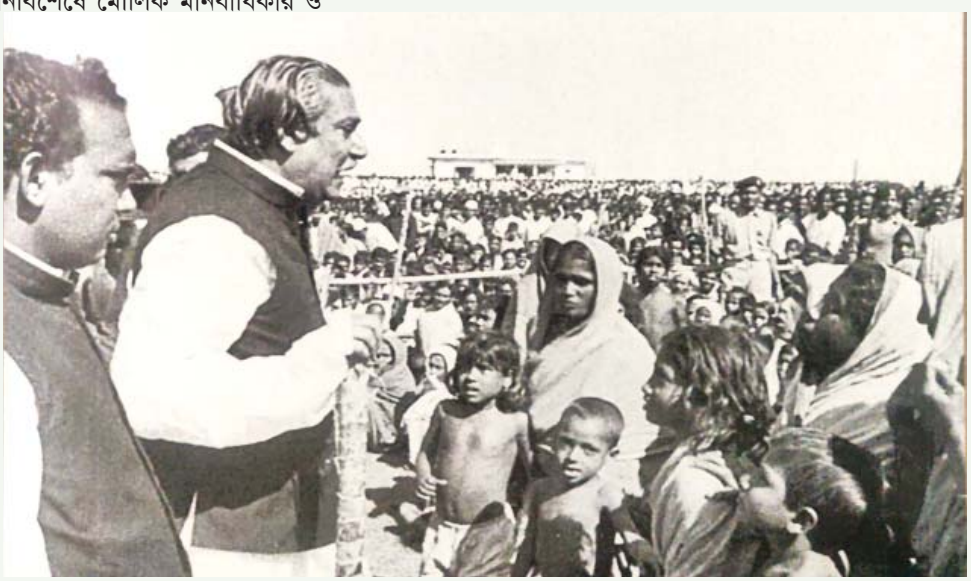

অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি, জনগণের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসায় মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে নতুন করে প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে উদ্যোগী হলেন। তিনি বলেন, '... সেকশন অফিসার, তারপর ডেপুটি সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, এডিশনাল সেক্রেটারি, সেক্রেটারি, মন্ত্রী হয়ে তারপর আসে আমার কাছে। এসবের কোনো প্রয়োজন নেই।' তিনি আরও বলেন, 'ইডেন বিল্ডিং (সেক্রেটারিয়েট) বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই, যাতে জনগণ সরাসরি তাদের সুযোগ-সুবিধা পায়।'

মূলত রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণকে সরাসরি সুবিধা দেওয়াই ছিল বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দকে 'বিনিয়োগ' নামে অভিহিত করেছিলেন এবং গণমুখী, অর্থনীতিতে কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। সমবায় গঠন করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। চারটি মূলনীতির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু দেশের দীন-দুঃখী-শোষিত-বঞ্চিত-শ্রমজীবী-মেহনতি মানবগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার এবং তাদের সমষ্টিগত শাসন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। আরও উল্লেখ করেছেন– প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ভেতরে কোনো বিরোধ নেই; সমাজের বাস্তব অবস্থাই মানুষের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। সংবিধানে তাই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে 'সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি' কথাটি রয়েছে। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ বাদ দিয়ে সমষ্টিগত মানবগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার চিন্তা তিনি করেছিলেন। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে এক পরিবারভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া প্রশাসনকেও জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেনাবাহিনীকে দেশের দৈনন্দিন কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

একটি সাক্ষাৎকারের শেষ ভাগে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন,

> আমি জাতির বৃহত্তর কল্যাণে এ পথে নেমেছি। জনগণ সমর্থন দিচ্ছে। তাই ষড়যন্ত্র করে, বাধার সৃষ্টি করে, হুমকি দিয়ে আমাকে নিবৃত করা যাবে না। আমার কাজ আমি করে যাবই। ... হয়তো শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে। পরোয়া করি না। ... আমি যা বলি, তা-ই করে ছাড়ি। যেখানে একবার হাত দেই সেখান থেকে হাত উঠাই না। বলেছিলাম, এদেরকে মুক্ত করে ছাড়ব, মুক্ত করেছি। বলেছি, শোষণহীন দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ব, তা-ই করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। কোনো কিন্তু-টিন্তু নেই, কোনো আপোশ নেই।

এই সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেছিলেন তিনি যদি নাও থাকেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাঙালিরা যে-কোনো মূল্যে তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ ও লক্ষ্য একদিন বাংলার বুকে বাস্তবায়ন করে ছাড়বেন। এতে প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে বাঙালির ওপর আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেছিলেন।

তিনি সব মানুষের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বাকশাল গঠন করেছিলেন। কিন্তু কাজ শুরু করতে পারেননি। বাকশাল গঠন হওয়ার পর ধনী এবং প্রভাবশালী মহলও শত্রুতা শুরু করে। তারা মনে করে, তাদের হাত থেকে সম্পদ চলে যাবে কৃষক-শ্রমিকের হাতে। আবার প্রশাসনের আমলারাও চিন্তা করে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে জনপ্রতিনিধিদের কাছে; কিংবা জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। একইভাবে সামরিক বাহিনীতেও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল।

ফলে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক, সুবিধাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদীদের সম্মিলিত চেষ্টায় কিছু বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্য সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে (শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে থাকায় তাঁদের ব্যতীত) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে নৃশংসভাবে হত্যা করে ও ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় জঘন্যভাবে হত্যা করে। বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি, বাকশালের সমস্ত ধারা বাস্তবায়ন হলে এত দিনে বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হতো।

কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে সমতাভিত্তিক বণ্টনের মাধ্যমে মানবশক্তির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সম্পদের স্থিতিশীল কাঠামো তৈরি করা, যাতে বিদ্যমান জিডিপি সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয় এবং গণমানুষ এ অর্থনৈতিক সুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে পারে। জিডিপি বৃদ্ধির এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলত কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে। দেশ গড়ার কাজে হাত দিয়ে তিনি প্রথমেই কৃষির ওপরই জোর দিয়েছিলেন। সেচ পাম্প, সার, বীজ, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত অল্প সময়ে মাত্র ১০ মাসে জাতিকে একটি কার্যকর সংবিধান উপহার দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের আইন প্রণয়ন এবং এ আইন

বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠন– এসব বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হয়েছিল।

কিন্তু এ জঘন্য হত্যার পরে এর ভবিষ্যৎ বিচার প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ইনডেমনিটি আইন জারি করা হয়। রাষ্ট্রের সকল গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো, বঙ্গবন্ধুর কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ২১ বছর রেডিও-টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুকে দেখানো হয়নি। সামরিক শাসকের দল সেখানেই থেমে থাকেনি, তারা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের নামে নানান মিথ্যে ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যে ভরা গল্প চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পুনর্জীবন ঘটে। ফলে জীবনধারণের মান উন্নয়নে বাংলাদেশের জনগণের মাঝে অদম্য শক্তি উৎপন্ন হয়। জনগণের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও সামাজিক উন্নয়ন নীতির সংমিশ্রণে তৈরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২ বাস্তবায়ন করে। এটি ছিল সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল থেকে মজবুত ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসের ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন, বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার ৭.৫ শতাংশ বজায় রাখতে সমর্থ হয়। এই সংস্কারমূলক ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ, পরিবহণ, শিল্প ও বৃহদায়তন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। এখন অর্ধশতাধিক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিক্ষা খাতে বাজেট আনুপাতিক হারে বেড়েছে। নতুন এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকাস হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান। প্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব নয়। আশার কথা হলো, কৃষি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা খাতে উচ্চশিক্ষায় দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। এছাড়াও প্রায় ১০৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং কিছু অনুমতির অপেক্ষায় আছে।

বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ ঘটছে। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশ পাতাল রেল, নদীর নিচে টানেল, গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নিজস্ব টাকায় পদ্মা সেতুর মতো প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসিকতা দেখিয়েছে।

২০২১-২০২৫ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে, এর মধ্যে ২৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং প্রবাসে বাকি ৮০ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। দরিদ্রবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং জিডিপির হারও ক্রমবর্ধমান। সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে অর্থবছর ২০০৯ এবং অর্থবছর ২০১৯ মধ্যবর্তী টানা দশ বছর বাংলাদেশ নির্বিঘ্ন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করে। এই সময়কালে মাথাপিছু আয় ৭৫৪ ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ২০৬৪ ইউএস ডলারে উন্নীত হয়, গড় আয়ু ৬৫ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩ বছরে উন্নীত হয়। বয়স্ক সাক্ষরতা ৫৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ শতাংশ, দারিদ্র্য ৩৫ শতাংশ থেকে কমে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে আসে। ফলে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক সংজ্ঞায়িত নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসে ২০২১ সালের আগেই ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পায়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এটি নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম উল্লেখযোগ্য অর্জন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্র ও প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের নেতৃত্বে। ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় ১২ বছর আগে ডিজিটাল প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ১৫ লক্ষ লোকের আইটি সেক্টরে কর্মসংস্থান হয়েছে। গ্রামে ৮ হাজার সেন্টারের মাধ্যমে ষোলো হাজার কর্মী ১৫০০ ধরনের সেবা প্রদান করছে। বর্তমানে আইসিটি সেক্টরের মাধ্যমে এক বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় করছে। এছাড়াও বর্তমানে করোনাকালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়কসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জরুরি সভা এবং কর্মকাণ্ড সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার অসমাপ্ত দ্বিতীয় বিপ্লবের লক্ষ্য পূরণে কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতার শুভ জন্মশতবার্ষিকীতে আমরা সবাই যেন কথা নয় কাজেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোদ্ধা হিসেবে সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখি। সেলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের প্রত্যেককে সৎ ও সোনার মানুষ হতে হবে। অবশ্যই একদিন আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠন করে বিশ্ব সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব।

প্রফেসর ড. প্রিয়ব্রত পাল: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, prbrpal@gmail.com

একুশে পদক পেলেন ২৪ জন

সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিককে ২০২২ সালের একুশে পদক প্রদান করেছে। স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ভাষা আন্দোলনে মোস্তাফা এম. এ. মতিন (মরণোত্তর) ও মির্জা তোফাজ্জল হোসেন (মুকুল) (মরণোত্তর); শিল্পকলায় (নৃত্য) জিনাত বরকতউল্লাহ; শিল্পকলা (সংগীত) নজরুল ইসলাম বাবু (মরণোত্তর), ইকবাল আহমেদ ও মাহ্‌মুদুর রহমান বেণু; শিল্পকলা (অভিনয়) খালেদ মাহমুদ খান (মরণোত্তর), আফজাল হোসেন ও মাসুম আজিজ; মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মো. মতিউর রহমান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (মরণোত্তর), কিউ. এ. বি. এম রহমান ও আমজাদ আলী খন্দকার; সাংবাদিকতায় এম এ মালেক; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে মো. আনোয়ার হোসেন; শিক্ষায় অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ; সমাজসেবায় এস. এম. আব্রাহাম লিংকন ও সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের; ভাষা ও সাহিত্যে কবি কামাল চৌধুরী ও ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ। এছাড়া, গবেষণায় ড. মো. আবদুস সাত্তার মণ্ডল, ড. মো. এনামুল হক (দলগত), (দলনেতা), ড. সাহানাজ সুলতানা (দলনেতা) এবং ড. জান্নাতুল ফেরদৌস (দলগত)। ২০শে ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এসব পদক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতিবেদন : মনোয়ারা বেগম

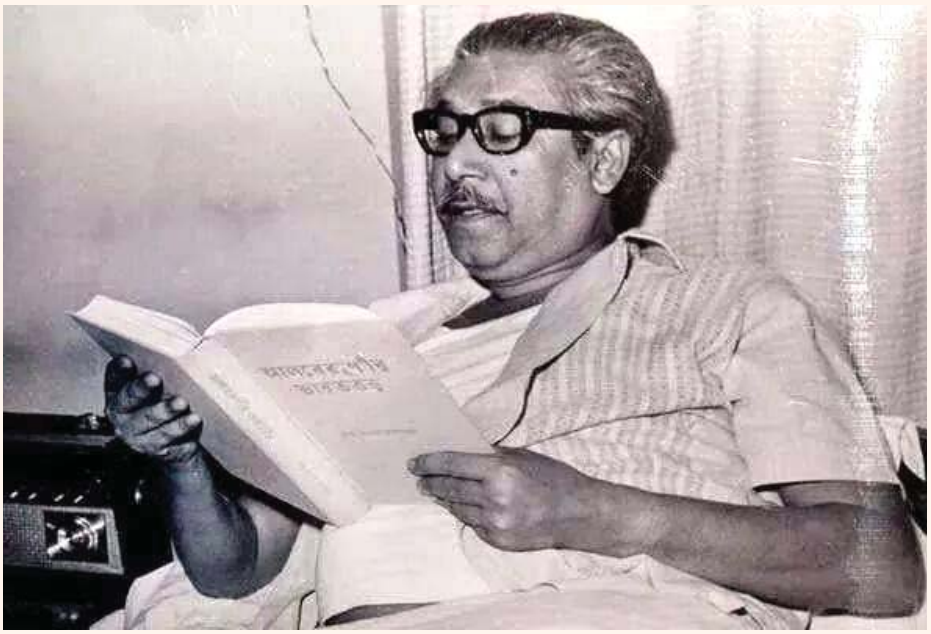

বাঙালি সংস্কৃতি: রবীন্দ্রনাথ থেকে শেখ মুজিব

কালী রঞ্জন বর্মণ

যে-কোনো জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা অথবা সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় একটি জটিল প্রক্রিয়া। বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আরও জটিল নানান ঐতিহাসিক কারণে। তবে এর একটি সহজ সংজ্ঞা বাতলে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ; আর তার মূল তাৎপর্য হলো, বাঙালি সংস্কৃতির মর্মমূলে অবিচ্ছিন্ন ও অভিন্ন যে উপাদান লুকিয়ে আছে– তার নাম বাংলা ভাষা। সমাজের ভিন্নতা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সংস্কৃতিতে যে ঐক্যের ধারা বহমান থেকেছে, তা এই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই। তিনি বলেছেন, 'আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে– আমরা বাংলা বলে থাকি।' এই ভাষিক নৈকট্যই এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, ঐক্যবদ্ধ করেছে সংস্কৃতিমান সমৃদ্ধ জাতি গঠনে। আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য উপাদান যাই থাক, বাংলা ভাষাই বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ।

ইতিহাস পরিক্রমায় এ সত্য এখন বিদিত যে, ইতঃপূর্বে অখণ্ড বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না এবং কোনো বাঙালি তা পরিচালনার অধিকারও পায়নি। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে খণ্ড খণ্ড রাজ্য সামন্ত প্রভুরা শাসন করেছেন, যাদের মধ্যে কেউই খাঁটি বাঙালি ছিলেন না। বাংলার সংস্কৃতি তখন বিবিধ প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা বারিত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সমন্বিত সামাজিক ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশের অভাবে আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সার্বিক অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি বলতে সমন্বিত সংস্কৃতি চর্চার ধারণা ছিল দূরাগত। ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্বের প্রতিবন্ধকতা অনেকটা দূরীভূত হলেও সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতার কারণে তা ঐক্যধারায় বেশি দূর এগুতে পারেনি। হায়াৎ মামুদ বলেন, 'বাঙালিকে তার ইতিহাস-ধারায় বিভিন্ন সময়ে পরবশ্যতা মেনে নিতে হয়েছে। সেই অধীনতা কখনো আর্য শাসন ও সংস্কৃতির, কখনোবা বৌদ্ধ শাসন ও সংস্কৃতির, এসেছে মুসলিম শাসন ও তৎসঙ্গে মধ্য এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্য ইসলামি সংস্কৃতি, আবার ইংরেজ শাসন-বাহিত ব্রিটিশ সংস্কৃতিও। প্রত্যক্ষ শাসন থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি প্রভাবের বাহিরে বাণিজ্য সূত্রে আর্থসামাজিক সম্পর্কের অভিঘাতে পর্তুগিজ, দিনেমান, ওলন্দাজ বণিক সওদাগরেরাও এনেছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতি। বাঙালির জীবনযাত্রায়, খাদ্যাভ্যাসে ও সামাজিক আচরণে আর্থসামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্মতৎপরতা ও ভাবনা চলাচলে (Intercourse of Ideas) তাই বাঙালির প্রাগার্যশোনিত যেমন প্রবহমান তেমনি ইত্যাকার অন্যবিধ সংস্কৃতি সাংকর্য তার ধড়ের কাঠামোয় পেশিশক্তি ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি যোগ করেছে' (রবীন্দ্রনাথ, *অধরা মাধুরী*, পৃ. ৩১, শুদ্ধস্বর, ঢাকা)।

এই মিশ্র সংস্কৃতিই আমাদের প্রবহমান হাজার বছরের সংস্কৃতির পরম্পরা। যদিও এর মূল স্রোতোধারা এই ভৌগোলিক পরিসীমায় নদী নির্ভরতা ও কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উপর গড়ে উঠেছে। পরবর্তীতে সামন্ত যুগ অতিক্রম করে ব্রিটিশ উপনিবেশিক পরিমণ্ডলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের নতুন আলোয় স্নাত হয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে আধুনিক বাঙালি সংস্কৃতি একটি মার্জিত অবয়ব পরিগ্রহ করে। এই মার্জিত বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে হায়াৎ মামুদ বলেন, 'বাঙালি সংস্কৃতি মানে বাংলা ভাষা, বাঙালির সামাজিক আচরণ ও জীবন ধারার পদ্ধতি, ধর্মাচার, আবহমান কালের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং রবীন্দ্রনাথ। ... সাম্প্রতিক বাঙালির তিনি নির্মাতা; বাঙালি সংস্কৃতির চেহারা তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং তাঁর ভিতরে এসে বাঙালি সংস্কৃতি এক নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট মোড় নিয়েছে। বাঙালির সামাজিক আচরণে সুরুচির দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের দান। বঙ্গরমনীর পোশাক পরিচ্ছদের বিন্যাস তাঁর এক ভ্রাতৃবধূ বাঙালিকে শিখিয়েছেন। সভা-সমিতি অনুষ্ঠান পরিচালনা পদ্ধতি, জন্মোৎসব বা শোকসভা প্রভৃতি সামাজিক যৌথকর্মের উপযোগিতা ও ব্যবহার আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকেই শিখেছি' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৩, ১২৪)।

দেশ বা রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে সমাজে যখন ভাঙচুর হয়, অনিবার্য পরিবর্তন আসে, তখন সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটে। সংস্কৃতি তার আপন ধারায় চলে। বাঁক বদল হয়; গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু সংস্কৃতির সাথে রাজনীতির মেলবন্ধ তত সহজ নয়। কারণ সাধারণভাবে যারা সংস্কৃতিমনা, তাঁরা রাজনীতি মনস্ক নন। আর যারা রাজনীতি করেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশই তাদের নীতি ও বিশ্বাসের বহির্বৃত্তে

সংস্কৃতির প্রবহমান উৎসব ও উচ্ছ্বাসকে অগভীর উন্নাসিকতায় 'একটুখানি গান-বাজনার' মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া, তাঁর জীবনটাই গড়ে উঠেছিল একটি ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। তিনি ভালোবাসতেন বাংলার মানুষকে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে এবং রবীন্দ্রনাথকে। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পূর্ব বাংলার জনমানসের সাথে সম্পৃক্ত করেন আপন রাজনৈতিক চিন্তার আলোকে। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যাবতীয় সংগ্রামে শেখ মুজিবের সকল অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেলিনা হোসেনের ভাষায়– 'এই প্রেরণার উৎস হয়ে পূর্ববঙ্গের বাঙালির মানস দিগন্তে জলের মতো ঝরেছেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিতজন তাঁকে ধারণ করেছিলেন সংস্কৃতির সবটুকু আলোর ছায়ায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনচর্চায় এবং নিজের শিল্প ভুবনে বাঙালির ঐতিহ্য ও বাঙালিত্বের বিশেষত্বকে ধারণ করেছিলেন আপন প্রজ্ঞায়। জমিদারের সন্তান হয়েও নিম্নবর্গের মানুষকে উপেক্ষা করেননি। ... এই মানুষকে পূর্ববঙ্গের গণমানুষের সামনে নিয়ে এসেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনাকে বুঝিয়েছিলেন দেশমাতৃকার 'বদন মলিন হলে' কি দায়িত্ব পালন করতে হবে' (*পূর্ববঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেখ মুজিবুর রহমান*, পৃষ্ঠা. ৪৪, কথা প্রকাশ, ঢাকা)।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ব্যত্যয় ঘটিয়ে পাকিস্তানের জন্মের পর পরই পূর্ব বাংলার জনগণ বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের স্বপ্ন ছিল একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কেবলমাত্র ধর্মীয় ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে শীঘ্রই পূর্ব বাংলার জনগণের মোহমুক্তি ঘটে। মুখ্যত তারই ফলশ্রুতিতে এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অনুকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। অচিরেই এই স্বপ্ন ভঙ্গের অন্যতম প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে উদ্ভূত হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বাংলা ভাষাকে 'ব্রাত্য' জ্ঞানে উপেক্ষা করা– যা ১৯৪৮ সালেই উপেক্ষা ও অসাম্যের প্রান্ত সীমায় চিহ্নিত করে দেন পাকিস্তানের স্রষ্টা স্বয়ং কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে হতাশা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ন্যায্যতা প্রশ্নে বৈষম্য, রাজনৈতিক টালবাহানার মাধ্যমে নানান প্রতিবন্ধকতা পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ ও সংগঠিত হতে সাহায্য করে। এরই ধারাবাহিকতায় সময়ের স্বল্প পরিসরে ঘটে যায় বাহান্নর ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ প্রদেশের জনগণের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে এ অঞ্চলেও যে ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয়েছিল, বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে অর্জিত চেতনা তাকে ছাপিয়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিকশিত হতে থাকে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার বদলে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা বাংলা সংস্কৃতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এই নবচেতনার তাৎক্ষণিক ফলাফল অর্জিত হয় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে।

বিশ্বযুদ্ধত্তোরকালে সারা পৃথিবীর ন্যায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যেও চিন্তা-চেতনার একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। বামপন্থি রাজনৈতিক ধারা, প্রগতিশীল চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা এ দেশের ছাত্র, তরুণ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিককে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তার ঢেউ লাগে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যতই বাংলা সংস্কৃতির উপর আঘাত হানার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে, ততই পূর্ব বাংলার মানুষ আরও বেশি প্রতিবাদী, আরও বেশি সংগঠিত ও অপ্রতিরোধী হয়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে একটি সুস্থ, প্রগতিবাদী, অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বাঙালির নবচেতনার এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারাকে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ধারায় যুক্ত করতে সক্ষম হন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনার স্রোতের যৌথ জোয়ারে পাকিস্তানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক অনন্য উচ্চতায় উন্নীত হয়।

সংস্কৃতির প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা ও মানসিকতা এখানকার রাজনীতির অঙ্গনে এক নতুন বার্তা বহন করে আনে। এই নতুন আলোর ঝলকানিকে কাজে লাগিয়েই সেই সময়ের পূর্ববঙ্গের রাজনীতি অঙ্গনের তরুণ প্রজন্ম একটি প্ল্যাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হন। আর এই তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে এগিয়ে আসেন অকুতোভয় সপ্রতিভ প্রাণবন্ত তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। রাজনীতি এবং সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় না থাকলে কোনো সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। সামন্ত যুগের পর ব্রিটিশ উপনিবেশিক যুগে প্রায় দেড়শো বছরে বাংলা সংস্কৃতির একটি নতুন প্রবহমান ধারা সৃষ্টি হলেও সমসাময়িক রাজনীতির সাথে তার সংযোগ ছিল সামান্যই। অথচ রাজনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পরের পরিপূরক। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আহমদ ছফা

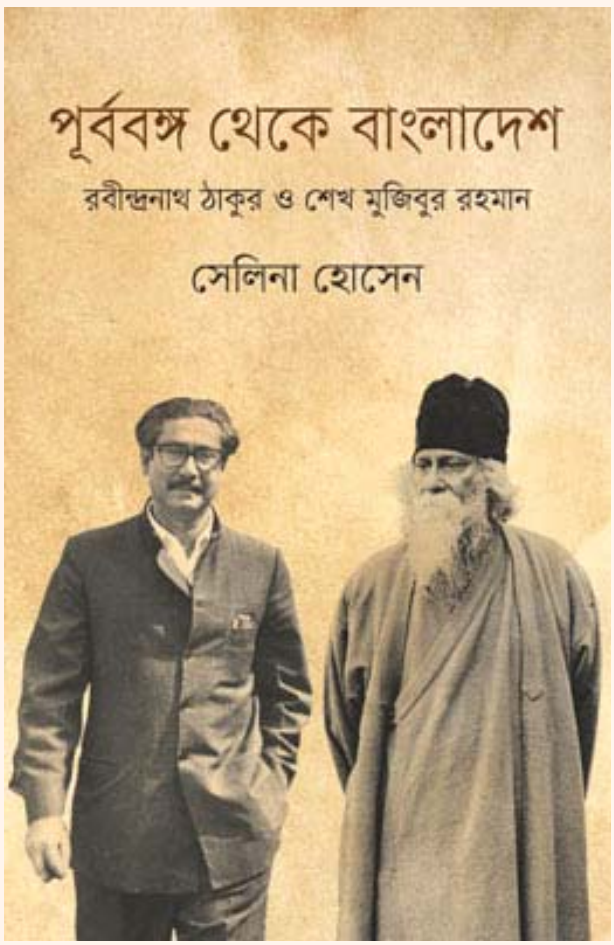

যেমন বলেন, 'একটি সমাজে সর্বাঙ্গীণ গতির নাম রাজনীতি এবং সংস্কৃতি রাজনীতির রসরক্ত...।'

কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণকে তাদের ধর্ম-সম্প্রদায়, শ্রেণি-পেশা, বিশ্বাস-আদর্শ ও বয়স নির্বিশেষে তিনি একই সাংস্কৃতিক চেতনায় যুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ের পর সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে উনিশশো একাত্তর সালে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির একটি ভিন্ন চেতনার কাঠামোগত অবয়বের অঙ্গীকারে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জন্য সাংস্কৃতিক ঐক্য ব্যতীত রাজনৈতিক ঐক্য ছিল অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল শেখ মুজিবের অনবদ্য নেতৃত্ব। এ কারণেই তিনি অসাধারণ, তিনি বঙ্গবন্ধু, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

তাঁর সমস্ত হৃদয়জুড়ে ছিল শুধু বাংলা, বাঙালি ও মানুষ। কী রাজনৈতিক চেতনায়, মন ও মননে, এমনকি ব্যক্তিগত জীবনাচরণেও তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। তাইতো গ্রামের সাধারণ প্রান্তিক মানুষকে ভালোবেসে আঞ্চলিক ভাষার টানে কথা ও জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি মুগ্ধ করেছেন সকল স্তরের জনতাকে। এটিও তাঁর বাঙালিত্বের একটি নিজস্ব স্টাইল। আর তাই বুঝি তাঁর মতো করে দৃপ্ত উচ্চারণে আর কোনো বাঙালি কখনও বলতে পারেননি– 'আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান'। এই হলো বাঙালি সংস্কৃতির নতুন রূপের উদ্ভাসন। যাঁর হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় নজরুল, তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রথম দাঁড়িয়ে মন উজাড় করে মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা পরিবেশন করেন। এর আগেও তিনি ১৯৫৩ সালে চীনের পিকিং-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে যেখানে সাঁইত্রিশটি দেশ অংশগ্রহণ করে) পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করে বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনাসভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলা নিয়ে তাঁর ভাবনা ও সংকল্পের কথা দৃঢ়চিত্তে প্রকাশ করেন; ভাষণে তিনি বলেন, "এক সময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বাংলা কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে... একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে বাংলা কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই... আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' (মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, পৃষ্ঠা. ৮৭, বাংলা একাডেমি)।" এমন অগ্রগামী চিন্তা ও অভিনব দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল, যিনি একটি জাতিকে হাজার বছরের একটি সমন্বিত চেতনায় উজ্জীবিত করে একই স্রোতোধারায় প্রবাহিত করার যুগপথ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে দেন এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর বজ্রকঠিন নেতৃত্বেই পূর্ববঙ্গের মানুষের সাম্প্রদায়িক আবেগের আবরণকে ভেদ করে অন্তরের অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক চেতনা দেশব্যাপী পরিব্যাপ্ত হয়ে একটি সর্বাত্মক জনযুদ্ধের উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী উদার বাম গণতান্ত্রিক চেতনার আলোকে আওয়ামী লীগকে তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী দলে পরিণত করার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৫৫ সালের ২১শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম আওয়ামী লীগে'র সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদনে পার্টিকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য পার্টির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। আওয়ামী লীগ সব সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন– 'আওয়ামী লীগ ও তার কর্মীরা যে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তারা জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র জনগণের মুক্তির পথ। ধনতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণকে শোষণ করা চলে। যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনদিন কোন রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান।' (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২৫৮)

১৯৪৭-এ ধর্মীয় জাতীয়তার কাছে পরাজিত হয়েছিল ভাষাগত জাতীয়তা। সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতজানু হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যূথবদ্ধ ঐতিহ্যিক চেতনা। বাংলা আবার ভাগ হলো– চিরতরে, উভয়পক্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার কারণে। আটচল্লিশে ভাষা কেন্দ্রিক প্রতিবাদ এবং বাহান্নে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পরিণতিতে তার অসামান্য অর্জন মূলত বাঙালির শাশ্বত অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বিকাশ এবং এভাবেই একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বাতাবরণ সৃষ্টির কারণে তৎকালীন রাজনীতিকেও তা প্রভাবিত করে। ফলে ভাষা আন্দোলনের দুবছরের মাথায় পূর্ববঙ্গের আইনসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রকে পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের সংকীর্ণতার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণে উৎসাহিত করে।

দেশবিভাগের পরও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা কেবলমাত্র নিজেদেরই 'বাঙালি' বলে শনাক্ত করলেও কিছুদিনের মধ্যে তারা আর বাঙালি থাকলেন না। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'তারা আট আনা ভারতীয় এবং চার আনা বাঙালি হয়ে থাকলেন– তাও পুরোপুরি নয়'। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি ভদ্রলোকদের 'বাঙ্গাল'দের প্রতি অবহেলা এবং শহুরে শিক্ষিত উর্দুভাষী মুসলমানদের উন্নাসিকতার কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা আগে নিজেদের 'বাঙালি' বলে চিহ্নিত না করলেও দেশবিভাগের কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, বিশেষভাবে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ষাটের দশকে তাদের কাছে বাঙালি পরিচয়টাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। ক্রমবিকাশমান এই আত্মপরিচয়ের বিষয়ে গোলাম মুরশিদ বলেন, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলায় এই মনোভাব দেখা দিতে আরম্ভ করে। যেমন, মুসলমানরা নিজেদের বাঙালি পরিচয় নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে শুরু করেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সঙ্গীত তাদের এই গর্বের একটা প্রধান উপাদান বলে বিবেচিত হলো। ... যে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি মুসলিমসমাজ কোন দিন ঠিক প্রসন্ন মনে আপনজন অথবা নিজেদের কবি হিসেবে গ্রহণ করেননি, সেই রবীন্দ্রনাথকেই পরিবর্তিত পরিবেশে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ভালোবাসলেন এবং নিজেদের লোক বলে মেনে নিলেন। কেবল তাই নয়, এসময়ে

তিনি পূর্ব বাংলার ভাষাভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হলেন।' (*বাংলা ভাষার উদ্ভব ও অন্যান্য*, পৃষ্ঠা. ৭০, ৭৯, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা)

'বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল দীর্ঘ দু'দশকের ভাষাভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ফলে' (গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর*)। এই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ বলতে ভাষাভিত্তিক পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক বাঙালি জাতীয়তাবাদই বোঝানো হয়েছে। কারণ ১৯৪৭ সালে ঐতিহাসিক কারণে বাংলা দুটি অংশে বিভক্ত হওয়ার পর বাংলা সংস্কৃতি বিকাশে দুটি অংশই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এক্ষেত্রে একটি অংশ পূর্ববঙ্গ ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনায় প্রবল রাজনৈতিক পরাক্রমে সমৃদ্ধির অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে একটি নতুন দেশ– বাংলাদেশের জন্ম দেয়। অপর অংশ পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি আছে, বাংলা ভাষাও আছে, কিন্তু সে রাজ্যের সাহিত্য সংস্কৃতি রাষ্ট্রীয় বিবেচনায় আঞ্চলিকতার বিচারে সীমায়িত। সর্বভারতীয় 'হিন্দি' ভাষার সর্বগ্রাসী দাপটে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি হারাতে বসেছে তার আত্মবিকাশের অধিকার; আর বাঙালি হারাচ্ছে তাদের গর্ব ও ঐতিহ্য। এ কারণেই বুঝি একদা সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, 'বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রীক থাকবে না, সেটা বাংলাদেশ কেন্দ্রীক হয়ে যাবে।' এর পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান থাকলেও প্রধান কারণ ভাষা কেন্দ্রীক রাজনীতি, যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংগীতকার কবীর সুমনের একটি গানেও আমরা এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই– 'দরকার হলে আমি খুব প্রাদেশিক, রাষ্ট্র মানি না নিজের ভাষাকে ভুলে...।'

কিন্তু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অপার সম্ভাবনায় উজ্জ্বল বাংলাদেশের বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতসহ চিরায়ত লোকজ সংস্কৃতির এই সমন্বিত বিকাশ সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নতুন 'বাংলাদেশ' নামক একটি বাস্তব রাষ্ট্রের জন্মের কারণে। আর এর জাদুকরী নেতৃত্ব যাঁর হাতে ছিল, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের ভৌগোলিক পালাবদল, রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং সংস্কৃতির বাঁক বদলের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর সফল নেতৃত্বের কারণেই এই আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির এক নতুন ধারার যাত্রা শুরু। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্যেই তিনি বাঙালির জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি।

চল্লিশের দশকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হলেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধিকাংশ শিক্ষিত জনমানসে একটি অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক একাধিপত্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য এবং বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের বহু প্রত্যাশিত অর্জন এই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিয়ানা পরিবেশ গড়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। নিজেদের মাতৃভাষা প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে আগে দ্বিধা থাকলেও ভাষা আন্দোলনের পর তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা থাকল না। এরপর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তারা নিজের বলেই গণ্য করেন, তাকে আপন বলেই ভালোবাসতে আরম্ভ করেন এবং দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের চিহ্নিত করেন 'বাঙালি' বলে।

ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে জনসমক্ষে অভিষিক্ত করাকে শেখ মুজিব চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন এবং এটি ছিল একদিকে তাঁর বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিষিক্ত শ্রেয়োবোধ; অপরদিকে রাজনৈতিক কর্মকৌশলের অংশ। এ বিষয়ে সেলিনা হোসেন লিখেছেন– 'এখানেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দর্শনের বিশেষত্ব। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ ঘোষণার বিষয়টি তাঁর কাছে শুধু চ্যালেঞ্জ গ্রহণের বিষয় ছিল না। একটি কলেজের বড়ো অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করে তিনি বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, বাঙালি জাতিসত্তার বোধের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। নিজের দেশবাসীকে বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিকাশ এ দেশে রুদ্ধ হবে না। তিনি আমাদেরই চেতনার আলোক শিখা। আমাদের লোক। শেখ মুজিবুর রহমানের চিন্তা-চেতনায়-মননে তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৪০)।

শেখ মুজিবের রবীন্দ্রপ্রীতি সম্পর্কে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'কবিগুরুর আসন বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্তস্তলে। রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন, দুঃখ-দৈন্য সর্বমুহূর্তে তাঁকে দেখতাম বিশ্বকবির বাণী আবৃত্তি করতে। ... কবিগুরুর সোনার বাংলাকে পবিত্রতায়, স্নিগ্ধতায় অপরূপ করাই বঙ্গবন্ধুর জীবনের পরম প্রার্থনা, এজন্যই তিনি নেমেছিলেন সংগ্রামে। আর তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে কবিগুরুর অমর বাণী।' (সূত্র: *দৈনিক সংবাদ*, ৮ই মে ১৯৭২)।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালি ও বঙ্গ সংস্কৃতিকে একটি মার্জিত ও পরিশীলিত অবয়বে অধিষ্ঠিত করে গেছেন; কিন্তু শ্রেণি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একটি নির্দিষ্ট সার্বভৌম ভূখণ্ডে স্বাধীন চিত্তে সংস্কৃতিচর্চার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করার বাস্তব কারণ ছিল তাঁর সাধ্যের অতীত। তবে এ নিয়ে তাঁর সাধনার অন্ত ছিল না, অন্তরের বুভুক্ষা ছিল অপরিসীম। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতিসাধনা ও চেতনার মর্মকথাকে অন্তরে ধারণ করে বাঙালির আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির সংকট মোচনে হাজার বছরের পথচলার হাহাকার তৃপ্ত হলো একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্মের মধ্য দিয়ে যার নাম– 'বাংলাদেশ'; যে দেশের জাতির পিতা– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কালী রঞ্জন বর্মণ: কবি ও লেখক, krbarman3535@gmail.com

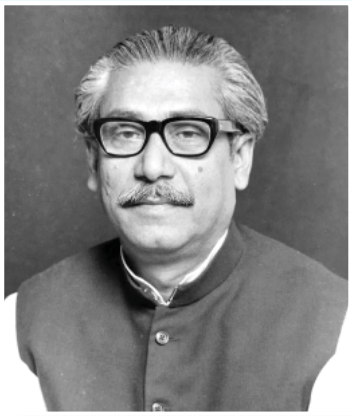

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনার আলোয় আজকের বাংলাদেশ

ফারুক নওয়াজ

শোষণ ও বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল– একটি সুশিক্ষিত জাতি গঠন। পাকিস্তানি নরকালয় থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন দেশের মাটিতে পা দিয়েই তিনি ধ্বংস-বিধ্বস্ত মাতৃভূমিকে পান। তিরিশ লাখ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত এ বিজয়, এই স্বাধীনতার আনন্দ তাঁর বেদনার অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাঁর বুক শোকভারে রুদ্ধ হয়ে পড়ে যখন জানতে পারেন, এ দেশের মানুষ গড়ার কারিগর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হানাদার ও তাদের এ দেশীয় অভিশপ্ত দোসর রাজাকার আলবদর ঘাতকরা পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। তিনি চিন্তিত হন, বর্তমান প্রজন্ম তাদের অবর্তমানে কীভাবে শিক্ষার আলোয় বিভূষিত হবে। কারণ, একটি সদ্য স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে চাই একটি শিক্ষিত জাতি। আর বুদ্ধিজীবীরাই ভবিষ্যতের জন্য সেই সুশিক্ষিত জাতি গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই হতাশার মধ্যেও বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেন একটি আলোকিত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

সেই ভাবনা থেকেই স্বাধীন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ছয় মাসের মধ্যেই তিনি যুগোপযোগী একটি শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাধীন দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন গঠনের পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত এক আলোচনায় বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে বলেন, 'আমাদের দেশের শিক্ষিতসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাতে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হন সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সব রকম চেষ্টা করা হবে। এজন্য কেবল তাদের বেতন স্কেল বৃদ্ধি ও বৈষয়িক সুবিধা দিলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষকদের ন্যায্য মর্যাদা এবং সম্মানও দিতে হবে।'

অবশেষে বঙ্গবন্ধু তাঁর সেই উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনকালে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটিবিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশনা দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এ কমিশন নিয়োগ করেছে।'

আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ভাবনায় শিক্ষা চিন্তা সেই শুরু থেকেই ছিল। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমল থেকেই, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর আত্মপ্রকাশের শুরু থেকেই শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নে তিনি সব সময় ছিলেন সোচ্চার। সেই সময়ের পত্রপত্রিকাগুলোতে চোখ বুলালে দেখা যাবে বিভিন্ন সভাসমিতি, জনসভায়, আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যে শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে দেশের ভাগ্যহত মানুষের কথা বলতে গিয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছেন।

সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিরোনামে ১৪ খণ্ডের সংকলনের প্রথম খণ্ডে (১৯৪৮ থেকে ১৯৫০) বঙ্গবন্ধুর এমন অনেক বক্তব্য উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ। সেখানে ম্যানিফেস্টোতে শিক্ষানীতি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়– 'রাষ্ট্রের প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে এবং প্রত্যেক নারী-পুরুষের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা সহজলভ্য করিতে হইবে। উচ্চতর শিক্ষা বিশেষ করিয়া কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি বৃত্তির সাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা উৎসাহিত করিতে

হইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে।'

বঙ্গবন্ধুর অগ্রণী ভূমিকায় ১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ৯ ও ১০ নং দফায় দলের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে–

১. দেশের সর্বত্র প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।
২. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী করিয়া বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১৯৫৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে প্রদত্ত এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমাদের দেশে ন্যূনতম শিক্ষা লাভেরও সুযোগ নাই। সিংহলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর পর্যন্ত প্রত্যেকেই এম.এ ডিগ্রি লাভ পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, অথচ আমাদের দেশে এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা লাভেরও সুযোগ নাই।' ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে বঙ্গবন্ধু এক ভাষণে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দর্শন তুলে ধরে বলেন, 'সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হইতে পারে না।'

স্বাধীন দেশে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠনের পর তার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একযোগে সরকারিকরণের মাধ্যমে। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ৩৬,১১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। এর ফলে ১,৫৫,০২৩ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারি হয় এবং ১৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়। বস্তুত বঙ্গবন্ধু সদ্য স্বাধীন দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করতেন শিশুদের। এজন্য শিশুশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন সবার আগে। তাঁর ভাবনাতে ছিল এই শিশুরাই আগামীতে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবে, তাই তাদেরকে আদর্শ শিক্ষায় চৌকস ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু দেশের যে প্রান্তেই যেতেন সভায়, সমাবেশে, আলোচনায় শিশুর শিক্ষার মান উৎকর্ষ এবং শিশুদের নিরাপদে বেড়ে ওঠার ব্যাপারে নতুন ভাবনার কথা বলতেন।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে ড. কুদরত-ই-খুদা রিপোর্ট বাস্তবায়নের মাঝপথেই ঘাতকরা সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নকেও হত্যা করে। প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতক গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায় কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালারও তিরোধান ঘটে সেখানেই।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ একুশ বছর পুরোপুরিই দেশ ছিল অন্ধকারে। সেই সময়েই শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেছে সন্ত্রাস, অরাজকতা, অব্যবস্থা। ১৯৯৬-এর পর নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা প্রথম রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পান। প্রকট সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে নতুন সরকারের পথচলা। পেছনের দুঃসহ স্তূপাকার আবর্জনা সরিয়ে এগিয়ে চলেছিল। পদে পদে বাধার মধ্য দিয়েই পাঁচটি বছর অতিক্রম করলেও ফের ক্ষমতার পালাবদলে থমকে যায় উন্নয়নের চাকা। শিক্ষাব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণের ধারার অপমৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয়বার ২০০৭-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভের পর অদ্যাবধি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের বহুমাত্রিক উন্নয়নধারা অব্যাহত রেখেছে। সেই ধারায় শিক্ষাব্যবস্থায় এসেছে যুগোপযোগী গতি। বঙ্গবন্ধুর ভাবনার পথেই প্রাথমিক শিক্ষায় অবৈতনিককরণ, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের সঙ্গে পোশাক ক্রয়ের ভাতাও যুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে নারীবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে কলেজ পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার আলোকিত দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির সাড়া লক্ষণীয়। জেলায় জেলায় গড়ে উঠছে বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মমুখী উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্ত করার পাশাপাশি সরকারিকরণ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি অসংখ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছে। আজ বঙ্গবন্ধু নেই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সবশেষে বলব, আমরা সফল হবই, আগামী বিশ্বের সুখের গল্প রচনা করবে আমাদের শিশুরা, প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নয়নের রোল মডেল হয়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

ফারুক নওয়াজ: সম্পাদক, মাসিক শিশু, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক

বদলে যাচ্ছে 'জনপ্রশাসন পদক'-এর নাম। চলতি বছর থেকে 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' নামে নতুন আঙ্গিকে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এ পদক দেওয়া হবে।

এই পদক দিতে ১লা ফেব্রুয়ারি 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০২২' জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকের সংখ্যা হবে ১২টি। বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকের নীতিমালায় বলা হয়, জনপ্রশাসনে কর্মরত কর্মচারীদের সৃজনশীল ও গঠনমূলক কার্যক্রমে উৎসাহিত করার মাধ্যমে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়নে উৎসাহিতকরণ ও সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর জনপ্রশাসন পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পদক প্রদানের কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)' বাতিল করে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। সাধারণ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন প্রশাসন, সামাজিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ও সংকট মেকাবিলা, অপরাধ প্রতিরোধ, জনসেবায় উদ্ভাবন, সংস্কার, গবেষণা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

যদি থাকে নৈতিকতা
আসবে সবার সফলতা

বঙ্গবন্ধুই প্রথম শিশুনীতি প্রণয়ন করেছিলেন

মাহবুব রেজা

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে
তার মুখে খবর পেলুম:
সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
জন্মমাত্র সুতীব্র চীৎকারে।

– সুকান্ত ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, শিশুকে তার প্রাপ্য অধিকার দিলে সে বড়ো হয়ে তার যথার্থ প্রতিদান দেশকে দেবে। সদ্য স্বাধীন দেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু প্রথম শিশুনীতি প্রণয়ন করেছিলেন। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়– যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে চারদিক থেকে নানা প্রতিকূলতা, বাধানিষেধ উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু একটি শিশুনীতি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন, শিশুও তার প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাবার যোগ্য এবং এই অধিকার থেকে তাকে কোনোভাবেই বঞ্চিত করা যাবে না। ১৯৭৪ সালের শিশুনীতিতে শিশুর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ধরা হয়েছিল ১৬ বছর। বঙ্গবন্ধু শুধু শিশুনীতি করেই বসে থাকেননি, তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে কার্যকর উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করার ফলে তিনি আর তা বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের কালরাত্রির পর তাঁর গৃহীত সকল উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ড পরাজিত শক্তি বন্ধ করে দেয়, তারা দেশকে চালিত করে পেছনের দিকে। বাংলাদেশ তখন ছিটকে পরে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা থেকে। সেসময় দেশের সকল কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রের একপেশে সিদ্ধান্ত এই স্থবিরতার অন্যতম কারণ।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার
সকল শিশুর সমান অধিকার

দেশের শিশু আইনে শিশুর বয়সসীমা

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ১৯৭৪ সালের শিশুনীতিকে শিশুর যে বয়সসীমা ছিল তা ২০১০ সালের সংশোধিত শিশু আইনে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১০ সালের শিশু আইনে ১৮ বছরের কম বয়সি সবাইকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে ৭৮টি ধারা থাকলেও নতুন শিশু আইনে ধারা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০৮টি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে 'শিশু'র বয়স নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে। শিশু আইন, শ্রম আইন ও ভবঘুরে আইনে ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সিকে শিশু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু সনদ অনুযায়ী ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু ধরতে হবে। আইনে শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই নীতিতে ১২ বছরের কমবয়সি শিশুদের কোনো ধরনের শ্রমে ও ১৬ বছরের কমবয়সি শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োগ নিষিদ্ধ করার বিধান রেখে শিশুদের জন্য ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। আরেকটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাহলো ১০ থেকে ১৮ বছরের কমবয়সিদের বয়ঃসন্ধিকালীন বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২

এই শিশুনীতির মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদের প্রেক্ষাপটে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, অধিকার বাস্তবায়নে জবাবদিহি নিশ্চিত করা, শিশু দারিদ্র্যবিমোচন, শিশুর প্রতি সব ধরনের নির্যাতন ও বৈষম্য দূর করা, শিশুদের জন্য গৃহীত সব পদক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। এই নীতির আওতায় রয়েছে শিশুর অধিকার বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ, শিশুশ্রম নিরসনের পদক্ষেপ, বাস্তবায়নের কৌশল, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়, উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে শিশুনীতির প্রাধান্য, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি, গবেষণা, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য অর্থের সংস্থান, আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন। শুধু তাই নয়, এই নীতিতে শিশু অধিকার ও তার উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন ও সেই কমিটিকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিশুর অধিকার অক্ষুণ্ন ও নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার বিষয়ক সনদে (সিআরসি) স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য, শিশু শিক্ষাসহ অন্যান্য কার্যক্রমে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার বিষয়ক প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখে এ উপমহাদেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেখানো পথে বাংলাদেশ অগ্রবর্তী হচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে দেশের সরকার সবসময় আন্তরিক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনে করেন দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিশুদের বঞ্চিত করে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তিনি নিজেও শিশুদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, আর্দ্র ও মমতাময়। শিশুদের ব্যাপারে যে-কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ ছাড় দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসী। 'সবার আগে শিশু'– এই শপথে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত হবে। প্রতিবছর দেশে গুরুত্বের সঙ্গে এ দিবস পালন করা হয়।

৩

শিশুদের সার্বিক অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য ১৯৯৬ সালে ১৭ই মার্চকে বেছে নেওয়া হয় 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে। সার্বিক শিশু পরিস্থিতির উন্নয়নে বর্তমানে একাধিক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রাইমারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন, প্রি. প্রাইমারি এডুকেশন প্রোগ্রামসহ নানা কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিনামূল্যে বছরের শুরুতে পাঠ্যবই সরবরাহের ফলে প্রায় ৩২ কোটি বই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে যা দক্ষিণ এশিয়াসহ পৃথিবীতে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক করতে সব ধরনের কর্মসূচি নিয়েছে।

মানব শিশুর জন্য শিক্ষা কোনো সৌখিনতা নয়। ব্যক্তিত্বের ও প্রতিভার সহজাত বিকাশ এবং মানসিক ও বুদ্ধিগত ক্ষমতার সুপ্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করার অন্যতম চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। শিক্ষা পাঠ্যসূচি ও বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতা অর্জনের ও উপলব্ধি লাভের যে বৃহত্তর পরিবেশ, প্রকৃতি ও সামাজিক ঘটনামালা সেখানেই শিশু তার রুচি ও স্বকীয়তা নিয়ে গড়ে ওঠে। এই সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ তৈরির জন্য চাই শিশুর পাঠযোগ্য বই। সৃজনশীল বই শিশু মনে তৈরি করে এক বিচিত্র অনুভূতির জগৎ, যে অনুভূতি তাকে নিয়ে যায় চিন্তাশীল জগতে। শিশু বয়সে তার মধ্যে যদি দেশপ্রেম, মানুষের জন্য ভালোবাসা, প্রকৃতির জন্য ক্ষমতা তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে বড়ো হয়ে সে দেশ ও দশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করবে। শিক্ষার মাধ্যমে যদি পরার্থপরতা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারা যায়, তাহলে তার সুফল দেশ ভোগ করতে পারবে। এই দিকটিকে উপজীব্য করে শিশুর শিক্ষায় বৈচিত্র্য আনতে সরকার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

আনন্দের মধ্যে শিক্ষাদান পদ্ধতিকেও বেশ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে বর্তমান সরকার আনন্দের মধ্যে শিক্ষাদান পদ্ধতি বহাল রেখে শিশু মনে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা তৈরি করতে সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরেও শিশুতোষ গল্প, উপন্যাস, নাটক, নীতিকথা, ছড়া-কবিতার ভেতর দিয়ে আগামী দিনের শিশুকে যুগোপযোগী করে তোলার মধ্য দিয়ে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করা সম্ভব।

মাহবুব রেজা: সিনিয়র সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক, athairidha15@yahoo.com

প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেলেন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পেলেন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারা দেশের মোট ৬৫৪ জন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ৬৫ জন এবং বাকি নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সম্মাননা দেওয়া হয়। সম্মাননা প্রাপ্ত সকল নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মারক, উত্তরীয়, শাড়ি ও স্যুভেনিয়র প্রদান করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সব বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর নিবাস' নির্মাণ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিনামূল্যে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। জেলা, উপজেলাসহ দেশের বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে চিকিৎসা, ওষুধ, টেস্ট যা প্রয়োজন সবই প্রদান করা হচ্ছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা এবং আত্মসম্ভ্রম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধারা। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে ও জাতীয় পর্যায়ে একসঙ্গে দেশব্যাপী নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিক সম্মাননা প্রদান করা হয়নি। এবারই আলাদাভাবে বাংলাদেশের সকল নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একই দিনে, একই সময়ে, একইসঙ্গে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

প্রতিবেদন: রোমান হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে মার্চ ২০২২ পটুয়াখালীতে পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর উপহার শতভাগ বিদ্যুৎ

মোতাহার হোসেন

স্বাধীনতার সময় ৩০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ নিয়ে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বিদ্যুৎ খাতের ভিত্তি রচনা করেননি, একইসঙ্গে ঘাতকের নির্মমতায় শহিদ হওয়ার ঠিক আগে আগে ব্রিটিশ গ্যাস কোম্পানির কাছ থেকে সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ডে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র কিনে নেন, যা দেশের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। এরপর ১৯৯৬ সালে জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আবার বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের উদ্যোগ নেন। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দায়িত্ব নেওয়ার পর বিদ্যুৎ খাত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। এর ফলে গত এক যুগে বিদ্যুৎ খাতের যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। ২০০৯ সালে ৪৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেত। বর্তমানে দেশে ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এখন দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। দেশের প্রতিটি ঘরে শতভাগ বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে ১১ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার অবিশ্বাস্য ও স্বপ্ন মনে হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ বিভাগ। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের ফলেই মাত্র ১২ বছরে বিদ্যুৎ খাতে বড়ো বিপ্লব ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের অবিশ্বাস্য উন্নয়নের রূপকার এবং স্বপ্নদ্রষ্টাই হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশই আসে বেসরকারি খাত থেকে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় লোডশেডিং শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২৭টি। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩৭টি। মাত্র ১২ বছরেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ১১৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের উৎপাদনক্ষমতা ছিল চার হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার ৫৪৮ মেগাওয়াট। ১২ বছর আগে দেশে বিদ্যুৎ গ্রাহক ছিল এক কোটি আট লাখ। বর্তমানে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় চার কোটি। সঞ্চালন লাইন ছিল আট হাজার সার্কিট কিলোমিটার, সেটা এখন প্রায় ১৪ হাজার সার্কিট কিলোমিটার। গ্রিড সাবস্টেশন ছিল ১৫ হাজার ৮৭০ এমভিএ, তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার এমভিএ। ২০০৯ সালে বিতরণ লাইন ছিল দুই লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার। এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬ লাখ কিলোমিটারের কিছু বেশি। ১২ বছর আগে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩০ কিলোওয়াট ঘণ্টায়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার মিশ্র ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্যাসের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়। তেল ও গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি কয়লা, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং সৌর, বায়ু, বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়। ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০% সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। দ্রুততম সময়ে চাহিদা ও উৎপাদনের ভারসাম্য রক্ষায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে বড়ো আকারের সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীও এগিয়ে আসছে। সরকারের ধারাবাহিকতা, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকায় স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এ খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এসব কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ায় এ খাতে স্বস্তি ফিরে আসে। সরকার মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প বাস্তবায়নে মনোযোগ দেয়। বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়নে মিশ্র জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তেল-গ্যাসের পাশাপাশি কয়লা এবং এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ শুরু করে।

বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বেশি হওয়ার কারণে লোডশেডিং হওয়ার সুযোগ নেই। মূলত লোডশেডিং হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে চাহিদা বেশি থাকলে একদিকে সংযোগ দিয়ে অন্যদিকে সংযোগ বন্ধ রাখা। উৎপাদন বেশি থাকায় সে

অবস্থা আর নেই। তারপরও মাঝেমধ্যে লোডশেডিং হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন বলেন, বর্তমানে দুটি বিষয়ের জন্য লোডশেডিং দেখা দেয়। একটি হলো, এখন সারা দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নে প্রচুর কাজ হচ্ছে, উন্নয়ন কাজের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করতে হয়। সে কারণে কোনো একটি লাইনে কাজ হলে সেটাকে বন্ধ রাখলে ওই এলাকায় তখন বিদ্যুৎ থাকে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, উৎপাদন ও গ্রাহক বাড়ছে কিন্তু ট্রান্সফিউশন ডিস্ট্রিবিউশন শতভাগ নিশ্চিত করা যায়নি। সে কারণে কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছে, সেগুলো আমরা চিহ্নিত করে কাজ করছি। অবশ্য এখন এ সমস্যা নেই। নবায়নযোগ্য জ্বালানির বড়ো একটি প্রসার হয়েছে। বর্তমানে ৬০ লাখ সোলারহোম সিস্টেম দিয়ে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। বায়ু বিদ্যুতের জন্য উইং ম্যাপিং হয়েছে। বর্তমানে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুই বছরের মধ্যেই মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস থেকে আসবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং ডিজেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, এর ফলে কমবে কার্বন নিঃসরণ এবং সরকারি ভরতুকি।

হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাশিয়ার সহায়তা নিয়ে দেশে নতুন করে বিদ্যুৎ খাত পুনর্গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশ পিছিয়ে যায়। তখন দেশে বিদ্যুতের সিস্টেম লস বেশি থাকায় দাতারা দেশের বিদ্যুৎ খাতে অর্থ দিতে চায়নি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আইপিপি নীতি গ্রহণ করা হয়। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বার্জ মাউন্টটেড বিদ্যুৎ নিয়ে আসেন। এ সময়ে সরকার কর্তৃক ক্যাপটিভ নীতি করে শিল্পে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়। এরপর ২০০৯ সালে আবার বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন থেকে প্রয়োজনীয় নীতির পরিবর্তন করে সরকার বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার করে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে আজ বিদ্যুৎ খাত এবং দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর সাশ্রয়ী এবং মানসম্মত সরবরাহ এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। সারা বিশ্বেই পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যুৎ সেক্টরেও পরিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনি ইশতাহারে ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। শেখ হাসিনা সরকারের সাহসী উদ্যোগে দুই থেকে তিন বছরে দেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তখন সরকারের নীতিই বিদ্যুৎ খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে। বর্তমান সরকার ভবিষ্যতের চাহিদা মাথায় রেখে পায়রা, মাতারবাড়ি, রূপপুর,

চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মধুমতি ১০০ মেগাওয়াট এইচএফও বেইজড বিদ্যুৎ কেন্দ্র

কেরানীগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ভেড়ামারা ৪১০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

খুলনা ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

মৈত্রী ২×৬৬০ মেগাওয়াট সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট কুলিং টাওয়ার কমপ্লেক্স

দেশে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠে ঢাকায় বিংশ শতকের প্রথম বছর। আর এর আর্থিক সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ। ৭ই ডিসেম্বর ১৯০১ সালে প্রথম ঢাকার রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি জ্বলে ওঠে। এর পূর্বে ১৯০১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা পৌরসভা কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানানো হয় যে, সকল রাস্তায় ও এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। পৌরসভার অধীনে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'দি ঢাকা ইলেকট্রিক ট্রাস্টি' নামে পরিষদ গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, পাকিস্তান সরকার দেড় বিলিয়ন ডলারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল এক হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। কিন্তু তখন দেশে মাত্র ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা ছিল। কিন্তু পশ্চিমা সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেয়নি। দেশ স্বাধীন

রামপালে মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া জ্বালানি খাতে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং টার্মিনাল, ঢাকা-চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ-হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর এবং বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে তেল সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। রামপালে মৈত্রী সুপার থার্মাল প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিদ্যুতের এই অর্জন মূলত পিতার জন্মশতবর্ষ এবং বিজয়ের ৫০ বর্ষে জাতিকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার। প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বিদ্যমান উন্নয়ন, অর্জনকে টেকসই করা হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নেও বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা জরুরি।

মোতাহার হোসেন: সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম, motaherbd123@gmail.com

ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা

প্রত্যয় জসীম

বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে শিল্প-সাহিত্যের নানা মাধ্যমে শিল্পীরা কাজ করেছেন। কবি লিখেছেন কবিতা, শিল্পীরা গান, চিত্রকর এঁকেছেন ছবি, ভাস্কর নির্মাণ করেছেন ভাস্কর্য। বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে শিল্পীরা চিত্রকর্মের পাশাপাশি নির্মাণ করেছেন ভাস্কর্য। ভাস্কর্যের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে উদ্ভাসিত করার এই তৎপরতাকে ছোটো করে দেখার উপায় নেই। কারণ আধুনিক প্রগতিশীল এই শিল্প মাধ্যমে অতি সহজেই হাজার হাজার পৃষ্ঠার ইতিহাস ধারণ করে একটি ভাস্কর্যই। 'ভাস্কর্যে বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা' শীর্ষক এ নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু ভাস্কর্যের পরিচয় তুলে ধরা হলো।

অপরাজেয় বাংলা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে অবস্থিত অপরাজেয় বাংলা মহান মুক্তিযুদ্ধের অনশ্বর চেতনাকে ধারণ করে আছে। বাঙালির দ্রোহ ও সংগ্রামের অপরাজেয় ইতিহাস এখানে মূর্ত হয়ে আছে। দুজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার পাশে ফাস্ট এইড বক্স কাঁধে ঝুলিয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে চলা সংগ্রামী নারীর মুখ, মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারীদের অংশগ্রহণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অপরাজেয় বাংলা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আইকনে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরাচার, সামরিক শাসন, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদবিরোধী আন্দোলনে অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্য আমাদের প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছে। অপরাজেয় বাংলার ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।

স্বাধীনতা সংগ্রাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার রোড সড়ক মোহনায় এ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আকাশস্পর্শী সেই সাতই মার্চের তর্জনী, স্বাধীনতা ঘোষণার সেই অবিনাশী বিকেলের ইতিহাস এই ভাস্কর্যে মূর্ত হয়ে আছে। লাল রক্তাক্ত বেদির মাঝখানে ক্রমশ সাত বীরশ্রেষ্ঠের প্রতিকৃতি, সবার উপরে উড্ডীন আমাদের জাতীয় পতাকা যেন মিশে আছে নীলাকাশে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যকে ঘিরে মাটিতে মূল বেদিতে অনেক খ্যাতিমান বাঙালির ভাস্কর্য স্থান পেয়েছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক ভাস্কর্যের মাঝে বঙ্গবন্ধুর মুখটি সবার উপরে স্থান পেয়েছে। বঙ্গবন্ধুর মহত্ব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি এই কথাটি প্রতীকী অর্থে তুলে ধরতে চেয়েছেন শিল্পী তাঁর ভাস্কর্যের মাধ্যমে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যটি উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ভাস্কর্যের নির্মাতা শিল্পী শামীম শিকদার।

স্বোপার্জিত স্বাধীনতা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি সড়ক মোহনায় এটি অবস্থিত। বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের যে অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য তাকে ধারণ করেছে এ ভাস্কর্য। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম নৃশংসতা ও গণহত্যার প্রতীকী উপস্থাপনা রয়েছে এ ভাস্কর্যে। বাঙালির স্বাধীনতা কারও দয়ার দান নয়, এটি বাঙালির ত্যাগের মহিমায় নিজেরই অর্জন। সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতা ঘোষণার উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...' এই দ্যুতিময় কথাগুলো পাথরের গায়ে খোদিত হয়ে আছে। মুক্তিযোদ্ধা বীর বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ এই ভাস্কর্যের প্রধান প্রেরণা। স্বোপার্জিত স্বাধীনতার ভাস্কর শিল্পী শামীম শিকদার।

বঙ্গবন্ধু স্কয়ার ভাস্কর্য: ঢাকায় গুলিস্তানে চার রাস্তার মোহনায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে নির্মিত হয়েছে এ ভাস্কর্য। সাতটি ফুলের পাপড়ি একাকার হয়ে আকাশের দিকে উড্ডীন। সাত বীরশ্রেষ্ঠকে এখানে প্রতীকী অর্থে তুলে ধরা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সাত বীরশ্রেষ্ঠের ত্যাগ জাতি কোনোদিন ভুলবে না। তাঁদের স্মৃতি অমর হয়ে আছে এ ভাস্কর্যের পাথুরে দেহে। এটির ভাস্কর সিরাজুল ইসলাম।

জাগ্রত চৌরঙ্গী: জয়দেবপুর চৌরাস্তা, ঢাকায় অবস্থিত এটি। মুষ্টিবদ্ধ এক হাতে গ্রেনেড, অন্য হাতে বন্দুক উঁচিয়ে রণসাজে ক্ষিপ্ত এক মুক্তিযোদ্ধার দুর্দান্ত ভাস্কর্য জাগ্রত চৌরঙ্গী। জাগ্রত চৌরঙ্গী প্রধানত ১৬তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে নির্মিত। ভাস্কর আবদুর রাজ্জাক নির্মিত এ ভাস্কর্যটি দেখলেই মনের ভেতর প্রতিরোধের প্রেরণা জাগে। জাগ্রত চৌরঙ্গী মুক্তিযুদ্ধের অবিনশ্বর চেতনাকে দ্যুতিময় করে ধরে রেখেছে প্রতিক্ষণ।

স্মারক ভাস্কর্য, কমলাপুর: বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে স্টেশন ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন। এর প্রবেশমুখে স্থাপিত হয়েছে স্মারক ভাস্কর্য। মুক্তিযোদ্ধার হাতে উত্তোলিত রাইফেল, আর বেদিতে একটি রেল ইঞ্জিন। দৃষ্টিনন্দন এ বিশাল ভাস্কর্য প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ করছে, আর মুক্তিযুদ্ধের মহিমায় যেন প্রকাশ করছে নিরন্তর এ ভাস্কর্য।

সংশপ্তক: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকায় এটি অবস্থিত। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার গৌরবদীপ্ত চেতনাকে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করেছেন শিল্পী হামিদুজ্জামান খান তাঁর সংশপ্তক ভাস্কর্যে। সংশপ্তক-এর আবহে প্রতিফলিত হয়েছে লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার সেই ধ্রুপদী বিশ্বাস– হয় মৃত্যু অথবা জয়। এখানে বোঝানো হয়েছে মরণপণ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধার একটি হাত ছিন্ন হয়েছে, ছিন্ন হয়েছে একটি পা, অথচ মুছে যায়নি তাঁর সংগ্রামের ও বিজয়ের প্রত্যাশা। একপায়ে হিরন্ময় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে এক হাতে বন্দুক নিয়ে অকুতোভয়ে যুদ্ধরত এই মুক্তিযোদ্ধার মহাকাব্যিক আবহ আমাদের হৃদয়ের গহীনে ঝড় তোলে। মৃত্যু আসন্ন জেনেও প্রাণপণে লড়ে যাওয়া সংশপ্তক ভাস্কর্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ত্রিশ লাখ বাঙালির প্রাণ বিসর্জনেও স্বাধীনতার চেতনা পরাভূত হয় না। বাঙালির বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য থাকবে, আপন মহিমায় আলোকিত হয়ে।

স্মারক ভাস্কর্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে নির্মিত হয়েছে এ ভাস্কর্য। স্বাধীনতার চেতনাকে মহিমান্বিত করে আছে এ ভাস্কর্য। ডানা ওড়া পাখির মুক্ত চেতনাকে আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মুক্ত স্বাধীন অনন্ত আকাশের দিকে ধাবমান পাখির ডানার সঙ্গে লাল-সবুজ উজ্জ্বল রং আমাদের পতাকার কথাই মনে করিয়ে দেয়। এটির ভাস্কর শিল্পী মর্তুজা বশীর।

বাংলার বিজয়: চট্টগ্রাম মহানগরীর বিপ্লব উদ্যানে এটি অবস্থিত। ১২ ফুট উঁচু বেদির উপর নির্মিত আকাশমুখো শৃঙ্খল মুক্ত কয়েকটি হাত। সবার উপরে একটি রাইফেল। এ ভাস্কর্যের বেদিতে স্থান

পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নানা দৃশ্যাবলি। চট্টগ্রাম শহরের একমাত্র ভাস্কর্য বাংলার বিজয়, এটির ভাস্কর আনোয়ার চৌধুরী।

সাবাশ বাংলাদেশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: অস্ত্র হাতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দুজন মুক্তিযোদ্ধা। একজনের এক হাত উত্তোলিত, বিজয়ের আভাস সেই হাতে উদ্ভাসিত। বাংলার দামাল ছেলেরা একাত্তরে যে অসীম সাহস ও শৌর্যবীর্য নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারই সিম্বলিক উপস্থাপনা 'সাবাশ বাংলাদেশ'। মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে গোলাকার বৃত্ত, সূর্যের এবং মুক্তির প্রতীক।

বিজয় স্তম্ভ, চাঁদপুর: মুক্তিযোদ্ধার হাতে উত্তোলিত স্টেনগান। আকাশের দিকে মুক্ত ভঙ্গিমায় যেন উড়ে যাবে এখনই। প্রশান্ত সরোবরের মাঝখানে এটি নির্মিত। জলের ভেতর ছায়া পড়ে ভাস্কর্যের। মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই ভাস্কর্য। এটির ভাস্কর শিল্পী সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ।

বিজয় '৭১, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিজয় '৭১ ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নির্মিত হয়েছে। অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধা এবং পতাকাকে আকাশের দিকে অসীম প্রত্যয়ে তুলে ধরার দৃশ্য এ ভাস্কর্যে মূর্ত হয়ে আছে। বেদিতে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তাক্ত অধ্যায়ের চিত্র। এর ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী।

দুর্জয় বাংলা, সিরাজগঞ্জ: পতাকা ও অস্ত্র হাতে মুক্তিযোদ্ধার দুর্জয় পদক্ষেপ এখানে উদ্ভাসিত। মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সিরাজগঞ্জ চণ্ডিদাগাতি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ক্যাম্পাসে এটি নির্মিত হয়েছে।

বীর বাঙালি, খুলনা: খুলনা শহরে নতুন রাস্তার মোড়ে এটি অবস্থিত। এর ভাস্কর লুৎফর রহমান তরফদার। খুলনা সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে এটি নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আবহ এ ভাস্কর্যে ধরা দিয়েছে নান্দনিকভাবে।

বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য, খুলনা বেতার কেন্দ্র: খুলনা বেতার কেন্দ্র প্রাঙ্গণে এটি নির্মিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ এর বেদিতে খোদিত আছে।

স্বাধীনতা ভাস্কর্য, ফরিদপুর: ফরিদপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে এটি নির্মিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে একটি হাত, একটি পা হারিয়েও প্রাণপণ লড়াইরত এক অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি এখানে মূর্ত হয়ে আছে। ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান এটির ভাস্কর। ফরিদপুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থা এটির নির্মাতা।

স্বাধীনতা ভাস্কর্য, নওগাঁ: নওগাঁ শহরের প্রাণকেন্দ্র ব্রিজের মোহনায় মুক্তিযুদ্ধের এ স্মারক ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। নওগাঁর সংসদ সদস্য মো. আব্দুল জলিলের উদ্যোগে এটি নির্মিত হয়। পতাকা হাতে ছুটে চলা মুক্তিযোদ্ধার পাশে অস্ত্র নিয়ে দৃপ্ত পায়ে এগুচ্ছে আরেক মুক্তিসেনা। ভাস্কর্যে এই দৃশ্য মূর্ত হয়ে আছে।

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী স্মারকস্তম্ভ শহিদমিনার। শহিদমিনার বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, থানা এবং প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে। বাঙালির সেক্যুলার সংস্কৃতিচর্চার চিহ্ন এই শহিদমিনার। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী 'স্বাধীনতার স্মারক ভাস্কর্য' অথবা 'বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা স্মারক ভাস্কর্য' নামে একই আদলের ভাস্কর্য সারা বাংলাদেশে নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে এখনই। আমাদের জাতীয় দিবসগুলোতে মানুষ সেখানে ফুল দিবে, ভাস্কর্যের বেদি চত্বরে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এভাবে বাঙালি সংস্কৃতিচর্চা বেগবান হবে, ইতিহাস ও সংস্কৃতিচর্চাকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্য ও চেতনাকে ধারণ করে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায়। দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের এখনই যথাযথ সময়। এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের একটা বড়ো পরিসর তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রত্যয় জসীম: কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সভাপতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ফাউন্ডেশন

২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় জেনোসাইড ওয়াচ এবং লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন-কে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ জেনোসাইড ওয়াচ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. গ্রেগরি এইচ স্টান্টন এবং লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন-এর কো-ফাউন্ডার ও কো-প্রেসিডেন্ট মিজ এলিসা জোডেন-ফোর্জি এবং ইরিনে ভিক্টোরিয়া মাসিমিনো-এর কাছে প্রেরিত পৃথক দুটি চিঠির মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের ধন্যবাদ জানান।

চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী তাদের স্থানীয় দোসরদের সহযোগে পরিকল্পিতভাবে যে ব্যাপক গণহত্যা ও অপরাধ সংঘটন করেছিল– সেটিকে আপনাদের পক্ষ থেকে গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়ে সমব্যথী হওয়ায় বাংলাদেশের জনগণ সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালের ১১ই মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশে প্রতিবছর ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করা হচ্ছে। আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 'জেনোসাইড কর্নার' স্থাপন করেছি।

জেনোসাইড ওয়াচ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক বাঙালি জনগোষ্ঠীর ওপর সংঘটিত অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীতে লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি জাতির উপরে সংঘটিত অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এছাড়া সংস্থা দুটি বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছে। গণহত্যা বিষয়ক সংস্থাসমূহের স্বীকৃতির ফলে ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে অগ্রগতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: শ্রীজা রাণী

দুর্নীতিকে না বলুন

দুর্নীতিকে না বলো
সৎপথে এগিয়ে চলো

বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক

কে সি বি তপু

বঙ্গবন্ধুই বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞায় কূটনৈতিক-রাজনৈতিক অভিজ্ঞানসমৃদ্ধ হৃদয়নিংড়ানো স্বতোৎসারিত সাতই মার্চের ভাষণ স্বাধীনতাপ্রিয় উত্তুঙ্গ বাঙালি জাতিকে এক পতাকাতলে সমবেত করে। এ ভাষণে বাঙালি জাতি দিক নির্দেশনা পায় ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয় লাভ করে। বাঙালির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি স্বাধীনতা অর্জন। আর এ অর্জনের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ছাব্বিশে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার আগে সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার ডাক। এ ভাষণে ঘোষিত 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে', 'মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইন্‌শাল্লাহ', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– ইত্যাদি তাঁর মর্মস্পর্শী তেজস্বী আহ্বান নিরস্ত্র বাঙালিকে বীর বাঙালিতে উন্নীত করেছে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ বাঙালির শিরায় শিরায় আবেগ আর উত্তেজনার ঢেউ তোলে এবং মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, '১৯৭১-এর আগে বাঙালি জাতি হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছে বলে বাঙালি জাতি স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছে। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে।'

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর আর্থসামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের দাবি আদায়ে অবিচল থাকায় তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। কিন্তু এতে তিনি দমে যাননি বরং জেল-জুলুম এমনকি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাঙালিদের একতাবদ্ধ করতে অদম্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন নানারকম রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু নিজেকে প্রস্তুত করেন। মূলত মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিক নির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। তাঁর সুদক্ষ ও সফল নেতৃত্বের ফসল স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ও লাল-সবুজের পতাকা, যা বিশ্বে বাঙালি জাতির নিজস্ব পরিচয় ও ঠিকানা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালির অধিকার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিয়ে একটি অভূতপূর্ব গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন। ছয় দফা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচির আপাত লক্ষ্য এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন অর্জন কিন্তু সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য মুক্তি অর্জন। তাজউদ্দীন আহমদ ও ছাত্রলীগের নেতাদের দৃঢ় সমর্থনের ফলে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচিকে দলীয় কর্মসূচি রূপে গ্রহণ করে। ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ছয় দফা ১৯৪৮-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বাঙালির সীমাহীন বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার সুচিন্তিত দলিল। ছয় দফা সংবলিত স্বায়ত্তশাসন দাবির মূল বক্তব্য ছিল প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতারা সারা বাংলায় এই ছয় দফাকে বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে অভিহিত করে প্রচার করেন। এই ছয় দফা দেশে গণজাগরণ সৃষ্টি করে, গ্রামগঞ্জে এর বার্তা পৌঁছে যায়।

ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে কর্মসূচি স্তব্ধ করে দেওয়ার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হয় দেশরক্ষা আইনে। আওয়ামী লীগের অন্যান্য প্রধান নেতাদেরও আটক করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতাদের মুক্তির দাবিতে ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানে পালিত হয় সর্বাত্মক ধর্মঘট। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আনা হয় দেশদ্রোহের অভিযোগ। দায়ের করা হয় রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য মামলা যা সাধারণভাবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মামলার বিচার শুরু হলে দানা বাঁধতে শুরু করে আইয়ুববিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবিদাওয়ার সাথে একটু কৌশল করে ছয় দফার মিশেলে এগারো দফায় রচিত হয় ছাত্রসমাজের

সত্তরের নির্বাচনের ফলাফল শুনছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে তাজউদ্দীন আহমদ এবং আওয়ামী লীগের সাত নারী নেত্রী

আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন। নভেম্বর মাসে সে আন্দোলন বেশ বেগবান হয়ে উঠল। আর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সে আন্দোলন পরিণত হলো অপ্রতিরোধ্য গণ-অভ্যুত্থানে; অবশেষে ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলো সরকার। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত গণসংবর্ধনায় সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' অভিধায় ভূষিত করলেন। তিনি মুজিব ভাই থেকে হলেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচিই ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের ভিত্তি। বঙ্গবন্ধুর অপরিমেয় কৃতিত্ব এখানেই যে, ছয় দফার সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলেও সরকার গঠন করতে না দিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ বঙ্গবন্ধু অসীম সাহসের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মহান বীরপুরুষ। তিনি বীর বাঙালির প্রতীকে পরিণত হন। সম্মোহনী শক্তির অধিকারী বাংলার জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ছিল ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি। তিনি রাজনীতির মহান কবি, যাঁর ভাষণ শুধু আকর্ষক নয়, কাব্যিক-ব্যঞ্জনাময়ও। তাঁর ভাষণ এবং এসব আন্দোলনে ধ্বনিত 'আমি কি তুমি কি, বাঙালি বাঙালি'; 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'; 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'– ইত্যাদি স্লোগান এবং জাতীয় পতাকা তৈরি ও উত্তোলন ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বীর বাঙালিতে পরিণত করে।

১৯৭১ সালের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা, সর্বোপরি ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর গ্রেপ্তারের পূর্বে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণাতেও ছিল তাঁর দূরদর্শিতা। তদুপরি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর সহকর্মীদের সত্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার গঠন এবং এ সরকার পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধ পেয়েছে বৈশ্বিক ও আইনগত বৈধতা। বঙ্গবন্ধুর অসীম সাহসী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণ ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যেই এনে দিয়েছে বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে স্বাধীনতা।

বঙ্গবন্ধুর প্রেস সচিব ও বিশিষ্ট সাংবাদিক তোয়াব খান লিখেন, '১৯৭১-এর আলোচিত ও সুপরিজ্ঞাত হলো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ই ছিলেন পাকিস্তানের জেলে। কিন্তু তাঁর আহ্বানে এবং সেই অর্থে নেতৃত্বে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। আমার মতে, মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো উপাদান ছিল বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ। এই এক ভাষণ বারবার প্রচারের মাধ্যমে লাখ লাখ সৈনিক যা করতে পারেনি, তা-ই করা গেছে। অতএব তিনি ছিলেন সেই অর্থে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের সর্বাধিনায়ক।' (তোয়াব খান, মহানায়ক, *প্রথম আলো*, ১৫ই আগস্ট ২০১৭)

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ ও গবেষক শামসুজ্জামান খান লিখেন–

> বঙ্গবন্ধুকে বলা হয় 'ক্যারিশমেটিক লিডার' (Charismatic Leader), অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে ক্যারিশমা গুণ যুক্ত হয়েছে। ক্যারিশমা কী? 'ক্যারিশমা' হলো 'সম্মোহনী' শক্তি। যে নেতার শক্তিশালী, আকর্ষণীয় ও অনন্য ব্যক্তিগত গুণাবলি অন্যকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে, তিনিই ক্যারিশমেটিক লিডার। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনে এই গুণাবলি অর্জন করেই হয়ে উঠেছিলেন দুঃখ-দৈন্যপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্ত ও উপেক্ষিত-বঞ্চিত বাঙালির মহান জাতীয়তাবাদী নেতা এবং বাঙালির শত-সহস্র বছরের স্বাধীন রাষ্ট্র কামনা বাস্তবায়নের মহান রূপকার। তাই তিনি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও স্রষ্টা এবং রাষ্ট্রনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রপিতা (Founding Father of Bangladesh State)। ...
>
> কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষ শত সহস্র বছরে নানা উপাদান, নানা ক্ষেত্রের প্রতিভাবানের তাৎপর্যপূর্ণ অবদানে ধীরে ধীরে একটি জাতি হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে; এবং কোনো একটা যুগে সেই জাতি তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মনস্তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রসত্তাগত চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। দেশের সর্বস্তরের ব্যাপক, বিপুল মানুষের মনে এই সর্বোচ্চ চেতনার স্তর সৃষ্টিতে যে নেতার প্রধান ভূমিকা থাকে এবং সে ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত হয়ে যখন তা একটা যুগ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় তখনই কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর মাহেন্দ্রক্ষণ। বাঙালি জাতির জীবনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ সর্বোচ্চ চূড়া স্পর্শ করে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। আর সেই চূড়ার ওপর দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
>
> ... পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো নেতা এমন ভয়ংকর জটিল পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে এত অকুতোভয়ে স্বাধীনতার কথা উচ্চারণের সাহস করেননি। এই নজিরবিহীন ঘটনার জন্যই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা, নিজস্ব রাষ্ট্রসত্তাগত বাঙালি জাতির জনক এবং

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা। (শামসুজ্জামান খান, *মুজিব কেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির জনক*)

পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ হত্যা মামলার রায়ের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ৮ই জানুয়ারি ২০২০ কয়েক দফা পর্যবেক্ষণসহ ২৯ হাজার ৫৯ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে–

> ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানসহ অন্য জাতীয় নেতাদের মন্ত্রিপরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ।
>
> নবগঠিত প্রবাসী সরকার জেনারেল এমএজি ওসমানীকে রণাঙ্গনের প্রধান (সেনাপ্রধান) নিযুক্ত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মুজিবনগর সরকারকে এসপি মাহবুবের নেতৃত্বে ইপিআরের ১২ জন বাঙালি সৈনিকসহ আনসার সদস্যরা প্রথম গার্ড অব অনার প্রদান করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্থান করে নেন।
>
> রায়ে বলা হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও এর ভিত্তি রচিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত করে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সময়ে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই। আর এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল একটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে এবং ওই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়েছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এবং গোড়া থেকেই এ সিদ্ধান্তের নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ...
>
> ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাতির উদ্দেশে দেওয়া দিক নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জাতির পিতার স্বাধীনতার ঘোষণা তৎকালীন ইপিআরের জুনিয়র অফিসার ও জওয়ানরাই ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ...
>
> (ওয়াকিল আহমেদ হিরন, 'বিডিআর হত্যা মামলার রায়ে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ:বঙ্গবন্ধুই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক', *দৈনিক সমকাল*, ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২০)

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। এতে রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বের বিষয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের নিম্নলিখিত ঘোষণাসমূহ প্রণিধানযোগ্য–

> ... যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, ...
>
> যেহেতু আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং ...
>
> সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং
>
> এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না-হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন,
>
> এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ...
>
> (পৃ. ১৫৩-১৫৪, সপ্তম তফসিল, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, এপ্রিল, ২০১৬)

বঙ্গবন্ধু এ দেশের মানুষের জন্য নিরন্তর ও নিরলস সংগ্রাম এবং দাবি আদায়ে দীর্ঘ কারাবাসের পরও তাঁর দৃঢ় মনোবল তাঁকে করে তুলেছিল জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনি দুবার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিল বাঙালির অনুপ্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধু বাঙালির জাতীয় চেতনার এক প্রজ্বলিত শিখা। মূলত বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির দর্শন ছিল সুদৃঢ় ও প্রগতিশীল। তিনি বাঙালির নাড়ির স্পন্দন, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করতেন। তাঁর এ উপলব্ধিই বাঙালির আকাঙ্ক্ষার ও মুক্তিসংগ্রামের একমাত্র পথপ্রদর্শক। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের গৌরবমণ্ডিত অর্জন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামের সর্বাধিনায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইতিহাসে চিরঞ্জীব, চির-অম্লান এবং বাঙালির চেতনায় অনির্বাণ শিখা হিসেবে প্রজ্বলিত থাকবেন অনন্তকাল।

কে সি বি তপু: প্রাবন্ধিক ও গবেষক, kcbtopu@gmail.com

বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা

মোহাম্মদ শাহজাহান

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মূল নেতা বা নায়ক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা, রাষ্ট্রের স্থপতি, দেশের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার ঘোষক, ইতিহাসের মহানায়ক– যে নামেই ডাকি না কেন শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের মুক্তির মহানায়ক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ২৪ বছরের মুক্তিসংগ্রামে শুধু নেতৃত্ব দেননি, একাত্তরের নয় মাস পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর কারাগারে বন্দি থাকার সময় তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত এবং মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' বলে হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন।

প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন বড়ো মাপের নেতা থাকেন। যেমন আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, রাশিয়ার লেনিন, চীনের মাও সেতুং, ভারতের মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, ভিয়েতনামের হো চি মিন, পাকিস্তানের জিন্নাহ এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির পিতা, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হিসেবে তাঁরা নিজ নিজ দেশে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত আছেন এবং থাকবেন।

বাঙালি জাতির শত বছরের ইতিহাসের গৌরবজনক ঘটনা হচ্ছে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ৩০ লাখ শহিদের রক্ত, দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি এবং সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর এই স্বাধীনতা অর্জিত হয়। ২৪ বছরের আন্দোলন সংগ্রাম এবং একাত্তরের নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করেই বিজয় ছিনিয়ে আনা হয়েছে। বাংলার অনেক সূর্য সন্তানই হয়ত বাঙালি জাতির শৃঙ্খল মোচনের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, ইতিহাসের মহানায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসে এক অমর নাম। তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী নেতা। কিউবার কিংবদন্তি নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো যথার্থই বলেছেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসে এই মানুষটি হিমালয়ের সমান। তাই আমি মুজিবকে দেখে হিমালয় দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।' কালের ইতিহাসে মুজিব সম্পর্কিত ফিদেল ক্যাস্ত্রোর এই ঐতিহাসিক উক্তি অবশ্যই শতভাগ সঠিক প্রমাণিত।

মুজিব ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে বিগত অর্ধ শতাব্দীতে শত শত বই এবং হাজার হাজার প্রবন্ধ-নিবন্ধ, কবিতা-গল্প লেখা হয়েছে। যতদিন এই বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে, বাঙালি জাতি বেঁচে থাকবে, ততদিন মুজিবের নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে– তা আজ বিশ্ব ইতিহাসের অংশ। যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হেনরি কিসিঞ্জার মুজিব ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন, কয়েক বছর আগে সেই দেশের অবমুক্ত গোপন দলিলে স্বীকার করা হয়েছে– 'শেখ মুজিব ২৫শে মার্চ রাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।' মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর পরিচালক রিচার্ড হেলমস অকপটে স্বীকার করেছেন– 'একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাত ১টায় গ্রেপ্তারের পূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন।' দলিলে আরও বলা হয়, মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের জন্য কিসিঞ্জারসহ অন্য মার্কিন পদস্থ কর্মকর্তারা ঐ সময় কী রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্টাফ হেরাল্ড সেন্ডার্স ও স্যামুয়েল হসকিনসন ১৯৭১-এর ৪ঠা মার্চ কিসিঞ্জারকে দেওয়া এক স্মারকে লিখেছেন: 'ঐদিন (৪.৩.১৯৭১) একাধিক বিদেশি সংবাদদাতাদের কাছে মুজিব 'অব দ্য রেকর্ড' স্বীকার করেছেন, তিনি ৭ই মার্চ রোববার পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যা ঘোষণা করবেন, তা স্বাধীনতার সমান।' (মিজানুর রহমান খানের লেখা ১৯৭১ *আমেরিকার গোপন দলিল*, পৃ. ৭৮-৭৯)।

অবমুক্ত মার্কিন গোপন দলিল আরও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, 'যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতেই শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট বার্তা পায় যে, তাঁর দাবি পূরণ না হলে তিনি (মুজিব) একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ এড়াতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশি কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।' এতে আরও বলা হয়, 'প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার সহকারী কিসিঞ্জার দুজনেই ফেব্রুয়ারিতে একমত হয়ে মুজিবকে জানিয়ে দেন যে, একান্তই যদি তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে।' (সূত্র : ঐ, পৃ. ৫৭)।

একাত্তরের ৭ই মার্চ ১০ লক্ষাধিক লোকের সামনে পাকিস্তানি কামান-বন্দুক-মেশিনগান উপেক্ষা করে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। রেসকোর্স ময়দানের সেই ঐতিহাসিক সমাবেশে মুজিব সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি দস্যু হায়েনারা সর্বশক্তি নিয়ে জনসভায় ঝাঁপিয়ে পড়ত। তখন রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত লাখ লাখ লোক শুধু নয়, শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হতো। তাছাড়া সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রাষ্ট্রের সংহতিবিরোধী বক্তব্য দেওয়ার জন্য শেখ মুজিব রাষ্ট্রবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হতেন। উল্লেখ্য, একাত্তরের কয়েক বছর আগেই জাতিসংঘের একটি সিদ্ধান্ত ছিল, 'কোনো রাষ্ট্রের সংহতিবিরোধীদের ইউএনও সমর্থন করবে না।' পাকিস্তান এই সুযোগটিই চাচ্ছিল। সেজন্য ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট জে. ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করেন। মার্চে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ইয়াহিয়া অভিযুক্ত করেন। ঘাতক ইয়াহিয়া ঐ ভাষণে

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, 'শেখ মুজিব ইজ এ ট্রেইটর টু দি নেশন, দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিশড।'

এত কিছুর পরেও বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মুজিব মনে করতেন, পাকিস্তানিরা যে-কোনো সময় তাঁকে হত্যা করতে পারে। আর এই আশঙ্কা থেকেই ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দিবে।' স্বাধীন দেশের সরকারপ্রধানের মতো স্বাধীনতার মহানায়ক ভাষণে আরও বলেন, 'যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো– কেউ দেবে না।' কাজেই ৭ই মার্চ সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলে তা হতো আত্মঘাতী। প্রফেসর মো. আবু নসর লিখেছেন, '৭ই মার্চ এবং বঙ্গবন্ধু ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ইতিহাস দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের।... মুক্তিপাগল বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় গর্জে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ কণ্ঠের সাহসী উচ্চারণই স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা। এই নির্দেশনা পেয়েই মূলত সারা দেশে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের ইতিহাসের মূল্যায়নে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণই স্বাধীনতার অভ্যুদয়ের প্রামাণ্য দলিল ও ঘোষণাপত্র। যার প্রতিটি শব্দ মুক্তিসংগ্রাম আর স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিল।' (*ইত্তেফাক*, ২০.৩.২০১০)

সরদার সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন, '৭ই মার্চ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটল এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলো। রেসকোর্স ময়দানে সেদিন সরকারি কর্মকর্তা, রেডিও-টেলিভিশন, পুলিশ বাহিনীকে একমাত্র বঙ্গবন্ধু তাঁর নির্দেশ ছাড়া অন্য কারো (পাকিস্তান সরকারের) নির্দেশ মানতে নিষেধ করেন।' একইভাবে পাকিস্তানের সামরিক চিন্তাবিদ জেনারেল কামাল মতিনউদ্দীন তার *ট্র্যাজেডি অব এরর* গ্রন্থে লিখেছেন, '৭ই মার্চ সবদিক দিয়েই ছিল মুজিবের দিন এবং প্রকৃতপক্ষে ঐদিনই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।' (পৃ. ১৯০)

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাক দেননি। প্রকৃতপক্ষে ঐদিন থেকেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এরপর ১৫ই মার্চ ৩৫টি নির্দেশ জারি করে নির্বাচিত সরকারপ্রধানের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের শাসনভার হাতে তুলে নেন। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে ডিফ্যাক্টো রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিবুর রহমান সারা দেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। দেশের সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। পাকিস্তানি রাজনীতিক ও বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান আসগর খান এবং পাকিস্তানি জেনারেলরা স্বীকার করেছেন, ঐদিন পূর্ব বাংলার ৭টি সেনানিবাস ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসেই পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক মৃত্যু হয়। তারও আগে ৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগের জনসভায় সবার উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা এবং কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা' গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর সশস্ত্র যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

শেখ মুজিব শুধু পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশের নয়, সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা ছিলেন। জনগণের নির্বাচিত নেতাকে হত্যা করলে বিশ্বজনমত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলে যেত। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধু যদি আত্মগোপনে যেতেন, তাহলেও বিশ্ববিবেকের সমর্থন তাঁর পক্ষে থাকত না। সেজন্য ২৫শে মার্চের আগে ৭ই মার্চ বা অন্য কোনো দিন শেখ মুজিবুর রহমান সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। পাকিস্তানি বাহিনী পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা শুরু করার পরের মুহূর্তটিই ছিল স্বাধীনতা ঘোষণার মাহেন্দ্রক্ষণ। কৌশলী, দূরদর্শী ও অসীম সাহসী মুজিব সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করেই ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন এবং থাকবেন। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাতে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন পাকিস্তানি সামরিক অফিসাররা পরে তাদের লেখা গ্রন্থে বহুবার উল্লেখ করেছেন।

জনগণের নির্বাচিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও যদি ২৫শে মার্চ রাতের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন, তাহলেও বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালে আন্তর্জাতিক সমর্থন পেত না।

পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিক তাঁর Witness to Surrender গ্রন্থে লিখেছেন, '২৫শে মার্চ রাতে (১২টা) পাকিস্তান বাহিনীর যখন প্রথম গুলিটি বর্ষিত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে পাকিস্তান রেডিওর সরকারি তরঙ্গের (ওয়েভ লেংনথ) কাছাকাছি একটি তরঙ্গ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ওই কণ্ঠের বাণী মনে হলো আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল, তাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করেন।' (ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড লোশাকের *পাকিস্তান ক্রাইসিস* গ্রন্থ)। স্বাধীনতা সংগ্রাম বা যুদ্ধের জন্য জনগণকে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুত করতে হয়। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে দুবার ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে এবং জীবনের দীর্ঘদিন কারা নির্যাতন ভোগ করে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

১৯৭১-এর ১২ই মার্চ লন্ডনের ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় বলা হয়: 'জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত শাসনকর্তা বলে মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়ি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে পরিণত হয়েছে। ইয়াহিয়ার কর্তৃত্ব শুধু সেনানিবাসে। সবাই ভিড় জমাচ্ছে মুজিবের বাড়িতে।' সে সময় বহু বিদেশি প্রচার মাধ্যমে বলা ও লেখা হয়েছে– 'All Roads lead to 32 No.' ১৫ই মার্চ ১৯৭১ বিশ্বখ্যাত টাইমস সাময়িকী লিখে, 'আসন্ন বিভক্তি অর্থাৎ পাকিস্তানকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত করার পশ্চাতে যে মানবটি রয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শেখ মুজিব।'

বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু একে অপরের পরিপূরক, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না। ইতিহাস বার বার প্রমাণ করেছে 'মুজিব বাংলার, বাংলা মুজিবের'। অথবা অন্যভাবে বলা যায়– 'বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ, বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধু।' দুই বাংলার বিখ্যাত কবি অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছেন, 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।'

মোহাম্মদ শাহজাহান: লেখক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও সাপ্তাহিক বাংলাবার্তার সম্পাদক, bandhu.ch77@yahoo.com

গুজব প্রতিরোধে প্রয়োজন জনসচেতনতা

মো. মামুন অর রশিদ

এই নিয়েছে ঐ নিল যাঃ! কান নিয়েছে চিলে,
চিলের পিছে মরছি ঘুরে আমরা সবাই মিলে।

... নেইকো খালে, নেইকো বিলে, নেইকো মাঠে গাছে;
কান যেখানে ছিল আগে সেখানটাতেই আছে।

গুজবে সাড়া দিয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে যে ফলাফল শূন্য, তা কবি শামসুর রাহমানের 'পণ্ডশ্রম' কবিতা থেকে সহজে অনুমেয়। কান চিলে নিয়ে যাওয়ার গুজবে মানুষের ছুটোছুটির অন্ত নেই কিন্তু কান তো কানের জায়গায় আছে।

গুজব মোকাবিলা করা বর্তমান সময়ের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। গুজবের ফলে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। গুজবের দৌরাত্ম্যে

মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে গুজব এখন ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের ভাষায়, গুজব হলো এমন কোনো বিবৃতি যার সত্যতা অল্প সময়ের মধ্যে অথবা কখনই নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। অনেকের দৃষ্টিভঙ্গিতে, গুজব হলো প্রচারণার একটি উপসেট মাত্র। গুজব সাধারণত ভুল তথ্য এবং অসংগত তথ্য এই দুই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভুল তথ্য বলতে মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্যকে বুঝায় এবং অসংগত তথ্য বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভ্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করাকে বুঝায়। গুজব প্রচার করা এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

গুজবের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো– এটি নির্ভুল খবরের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দ্রুত ছড়ায়। প্রত্যেক মানুষের একটি নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা আছে। মানুষের কোনো একটি বিষয় বা ঘটনা বিচার ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতাও আছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্তার ওপর আস্থা-বিশ্বাস হারিয়ে কোনো না কোনো গোষ্ঠী, দর্শন, নীতি ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষের যৌক্তিক চিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্ক ধারণা ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। মানুষ বাস্তবতার চেয়ে তার আবেগ দ্বারা বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার যৌক্তিক ধারণা থেকে সরে এসে তার গোষ্ঠী, দর্শন, নীতি ও আদর্শের বলয় দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষ কোনো একটি বিষয় বা ঘটনা মিথ্যা ও গুজব হিসেবে জানলেও সেটি তার বলয়ের স্বার্থ রক্ষায় সত্য বলে প্রচার করছে। যারা গুজব ছড়ায় তারা নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য আরেকটি প্রভাবক শক্তির কাল্পনিক ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

অপরাধ বিজ্ঞানীদের মতে, কলুষিত রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং ইতিবাচক রাজনৈতিক ধারার ক্ষতি করার মানসিকতা থেকে গুজব ছড়ানোর মতো অপরাধে মানুষ সম্পৃক্ত হয়। এর ফলে জনগণের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। ইতিহাসভিত্তিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, রাজনীতিতে গুজব বার বার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সম্পর্কে ইতিবাচক গুজবের পরিবর্তে নেতিবাচক গুজব সর্বদা অধিক কার্যকর হতে দেখা গেছে।

১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট এইচ কন্যাপ গুজবের গবেষণাকে বিবেচনায় নিয়ে *এ সাইকোলজি অব রিউমার* নামক একটি বই লিখেছেন। এই বইয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক হাজারেরও বেশি গুজবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। রবার্ট এইচ কন্যাপের মতে, গুজবের তিনটি মৌলিক দিক আছে। প্রথম দিকটি হলো, মানুষের মুখ। গুজব এক মুখ থেকে আরেক মুখে প্রচারিত হয়ে খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দিকটি হলো, গুজবটি জ্ঞান প্রদান করে। যে-কোনো গুজব মানুষকে সাময়িকভাবে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় এবং চিন্তার খোরাক জোগায়। তৃতীয় দিকটি হলো, মানুষের মন গুজব দ্বারা প্রভাবিত হতে চায় ও গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটাকে মাদকের আসক্তির মতো গুজবের আসক্তি বলা যায়।

গুজব প্রতিরোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো 'ট্রিপল ফিল্টার টেস্ট'। একটি গল্পের মাধ্যমে 'ট্রিপল ফিল্টার টেস্ট' সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

একদিন একজন লোক বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিসের কাছে এসে বললেন, 'সক্রেটিস, তুমি কি জানো এইমাত্র আমি তোমার বন্ধুর ব্যাপারে কী শুনে এলাম?' সক্রেটিস বললেন, 'এক মিনিট দাঁড়াও, তুমি আমার বন্ধুকে নিয়ে ঘটনাটি বলার আগে আমি তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করব। প্রথম প্রশ্নটি সত্য-মিথ্যা নিয়ে, তুমি কি নিশ্চিত তুমি আমাকে যা বলতে যাচ্ছ তা নির্ভেজাল সত্য?' লোকটি উত্তর

দিলো, 'না, আমি জানি না এটা সত্য কি না, আসলে আমি একজনের কাছে শুনেছি।'

সক্রেটিস বললেন, 'তাহলে তুমি নিশ্চিত না যে তুমি যা বলবে তা সত্য। এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, তুমি কি আমার বন্ধু সম্বন্ধে ভালো কিছু বলবে?' লোকটি উত্তর দিলো, 'নাহ, আসলে খারাপ কিছুই...।' সক্রেটিস বললেন, 'তাহলে তুমি আমার বন্ধু সম্পর্কে আমাকে খারাপ কিছু বলতে চাও এবং তুমি নিশ্চিত নও যে তা সত্যি কি না। ঠিক আছে, এখনও তৃতীয় প্রশ্ন বাকি, তুমি তৃতীয় পরীক্ষায় পাস করলে আমাকে কথাটি বলতে পারো। তৃতীয় প্রশ্নটি হলো, তুমি আমাকে যা বলতে যাচ্ছ তা কি আমার জন্য উপকারী?' লোকটি উত্তর দিলো, 'না, আসলে তোমার জন্য তা উপকারী নয়।' এবার সক্রেটিস শেষ কথাটি বললেন, 'যদি তুমি আমাকে যা বলতে চাও তা সত্যও নয়, ভালো কিছুও নয় এবং আমার জন্য উপকারীও না হয়, তবে আমাকে বলে কী লাভ!'

উল্লিখিত ঘটনাটি থেকে এটি পরিষ্কার যে, কোনো একটি তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে তা প্রচার করা ঠিক নয় এবং এরকম প্রচারণায় কান দেওয়াও উচিত নয়। কোনো একটি বিষয় বা তথ্যকে বিশ্বাস করার আগে আমরা তা সক্রেটিসের দর্শনভিত্তিক ধারণার মতো 'ট্রিপল ফিল্টার টেস্ট' করে নিতে পারি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে) তাই বলতে বা প্রচার করতে থাকে' (*বুখারি*)। কোনো ধর্ম গুজব বা মিথ্যা প্রচার সমর্থন করে না।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে গুজব বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। গুজব ছড়ানোর কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে– ছবিতে কারসাজি, বানোয়াট ভিডিও, সত্যের বিকৃত উপস্থাপন, নকল ও কাল্পনিক বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যমের অপব্যবহার প্রভৃতি।

গুজব প্রতিরোধে করণীয়

- কোনো বিষয় বা তথ্য প্রচার করার আগে তার সত্যতা যাচাই করতে হবে।
- অনলাইন এবং অফলাইন যে-কোনো মাধ্যমে মিথ্যা, অর্ধ-সত্য, বিভ্রান্তিকর এবং উসকানিমূলক বিষয় প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, তথ্য অধিদফতরের তথ্য বিবরণী ও প্রেস নোট, বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে সংবাদের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কোনো তথ্য খুব স্পর্শকাতর মনে হলে তা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ এবং তথ্য অধিদফতরের তথ্য বিবরণী ও প্রেস নোটের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রচারিত গুজব সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত কোনো বিষয়ে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করার আগে অবশ্যই তার সত্যতা যাচাই করতে হবে।
- ছবি বিকৃত করার মাধ্যমে মিথ্যা সংবাদ খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অনলাইনে প্রচারিত কোনো ছবি বিকৃত মনে হলে গুগল রিভার্স সার্চ-এর মতো টুল ব্যবহার করে সহজে ছবির উৎস যাচাই করতে হবে।

গুজবের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, গুজব শনাক্তে কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং গুজব সৃষ্টিকারীকে শাস্তির আওতায় আনার মাধ্যমে গুজব প্রতিরোধ করা সম্ভব। আসুন, আমরা সবাই গুজব প্রতিরোধ করি, সত্য প্রচার করি এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ি।

সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে
ইন্টারনেটে শেয়ার পরে।
সত্য-মিথ্যা যাচাই করি
গুজব থেকে দূরে থাকি।

মো. মামুন অর রশিদ: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাট

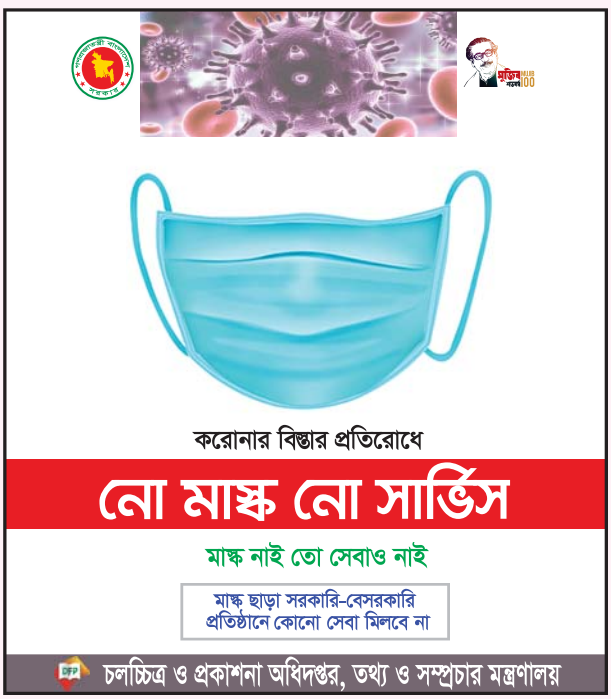

সরকারের অর্জন নারীর ক্ষমতায়ন

আফরোজা তালুকদার

বর্তমান সরকার নারীবান্ধব সরকার। নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের নারীরা এখন অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক দেশসমূহ থেকে এগিয়ে আছে। এমন কোনো কর্মকাণ্ড নেই যেখানে নারীদের পদচারণা নেই। তাছাড়া পুরুষের পাশাপাশি প্রতিটি পর্যায়ে নারী স্বমহিমায় কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন পুরুষ নারীদের দাসীরূপে পরিচালিত করত। সমাজে নারীকে বোঝা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এর কারণ হিসেবে ধারাবাহিকভাবে চলে আসা নারীর প্রতি বঞ্চনার সংস্কৃতি ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকেই প্রধানত দায়ী করা যায়। বেশির ভাগ সমাজ পুরুষশাসিত। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ধারণ করায় নারীরা পারিবারিকভাবেই অবহেলিত, বঞ্চিত এবং অধীনস্থ। নারীকে এই শিক্ষায় বড়ো করা হতো– সে দুর্বল, গৃহমুখী ও পুরুষের অনুশাসনের ও অবহেলার চাদর পরে তাকে বড়ো হতে হবে। অন্যের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে। খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা কিংবা ভোটাধিকার প্রয়োগসহ অন্যান্য মৌলিক অনেক চাহিদা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হতো। তাকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা দেওয়া হতো না। ফলে নিজের অজান্তেই নারী মাত্রই কারও অধীনস্থ এবং অবহেলিত– এই সংস্কৃতি ধারণ করে আসছিল যুগের পর যুগ ধরে।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা পেরিয়ে আমাদের সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন বেশ কজন নারী। সরোজিনী নাইডু, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সুফিয়া কামাল, সুলতানা রাজিয়া তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এছাড়া কয়েকজন অগ্রগামী নারী বিভিন্নভাবে নারী উন্নয়নে অবদান রেখেছেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে নারী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করেছেন ভিন্ন গতিতে। এমন কোনো কর্মস্থল নেই যেখানে তিনি নারীর ক্ষমতাকে ত্বরান্বিত করেননি। ব্যাবসাবাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, ফ্যাশন ডিজাইন, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটিফিকেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এই উদ্যোক্তা নারীদের জন্য প্রতি জেলায় জয়িতা ফাউন্ডেশন করে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করেছেন। তাছাড়া এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে নারীর পদচারণা পরেনি। দেশের স্পিকার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, বোর্ড-এর চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও সরকারের উচ্চপদস্থ বিভিন্ন পদে নারীরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর মতো চ্যালেঞ্জিং কাজে উচ্চপদে দক্ষতার সঙ্গেই দেশের মান সমুন্নত করছে নারীরা। এছাড়াও বিজ্ঞানী, ডাক্তার, নভোচারী, গবেষক, উদ্ভাবক, রাষ্ট্রনায়ক, যোদ্ধা থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে তাদের প্রতিভা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মিডিয়া জগতেও নারীর আধিপত্য এবং দাপট রয়েছে। এ অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া নানা নিষেধাজ্ঞা অনেকাংশে কমে গেছে। নারীরা এখন কর্মমুখী হয়েছে এবং অবদান রাখছে নিজ নিজ কর্মস্থলে। দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের উন্নয়নের জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

নারীর শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে শিক্ষার ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। এর ফলে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে বই প্রদান করছেন এবং দেশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সব ছাত্রীদের বিনামূল্যে অধ্যয়নে সহায়তা প্রদান করছেন। একটি শিশুও যাতে ঝরে না পরে সেই জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুদের ভাতা প্রদান করেন। আর এই সবকিছুই করা হচ্ছে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য। একজন শিক্ষিত নারী ঘরে-বাইরে সব জায়গায় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। যে জাতি যত মেধাবী, সে জাতি তত উন্নত হবে। এছাড়াও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে নারী শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থানকে মজবুতের জন্যে চাকরিজীবী নারীদের চার মাসের পরিবর্তে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করেছে। তাদের সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রেও বাবার পাশাপাশি মায়ের নামটি সংযুক্ত

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ৮ই মার্চ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করেন– পিআইডি

করেছে। এই দেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার। এই অধিকারকে নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাস হয়েছে। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সহায়তার জন্য ১০৯ হেল্প লাইন চালু করা হয়েছে। কার্যকর হয়েছে নারী ও শিশু অধিকার আইন। নারীর সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা, নিরাপদ পরিবেশ উপযোগী কর্মপরিবেশ তৈরি করতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। পোশাকশিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। এ শিল্পের সিংহভাগ কর্মী নারী। এক্ষেত্রে ৮০% আয় তাদের হাত ধরে। গার্মেন্টশিল্পে নারীর অবদানের কারণে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। ক্ষুদ্রঋণ ও ছোটো ও বড়ো উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর সংশ্লিষ্টতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নারী উদ্যোক্তাদের আরও এগিয়ে যেতে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বিনা জামানতে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক লোনের সুযোগ করে দিয়েছেন। নারীদের সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর আয়কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এছাড়া গ্রামীণ নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থানকে মজবুত করার জন্যে বিভিন্ন রকম ক্ষুদ্রঋণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের জীবনযাপনের মানোন্নয়ন ও কাজকর্মে সম্পৃক্ত করার জন্যে 'আমার বাড়ি, আমার খামার' প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তৃণমূল পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প এবং কুটিরশিল্প বিকাশের জন্যে সরকার আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। এই সহায়তাকে পুরোপুরি ব্যবহার করে নারীরা পরিবারকে আর্থিক সচ্ছলতা দিতে পারছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীরা এগিয়ে এসেছেন রাজনীতিতে। তিনি মন্ত্রণালয়ের অনেক বড়ো বড়ো দায়িত্বভার তুলে দিয়েছেন নারীদের ওপরে। এমনকি নারীরা যে সাচিবিক বড়ো বড়ো দায়িত্ব পালনে সক্ষম তা প্রমাণ করতে পেরেছেন। জাতীয় সংসদে স্পীকার পদে রয়েছেন নারী। সংসদে নারীদের জন্যে ৫০টি সংরক্ষিত আসনসহ পুরুষের পাশাপাশি তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারছেন। বর্তমান সংসদে সত্তরের অধিকজন নারী প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাছাড়া সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্যে আছে সংরক্ষিত আসন। এক অর্থে নারীসমাজকে এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে আনতে আগ্রহী করেছে বর্তমান সরকার। শহুরে নারীদের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীর অবস্থানের দিকে যদি তাকাই, তাহলে সেখানেও নারীদের উন্নয়নে বর্তমান সরকার বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় নারী অনন্য এক উচ্চতায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে নারীরা কোথাও কোথাও পুরুষকেও ছাড়িয়ে গেছে। তৈরি হচ্ছে নারীর জন্য উন্মুক্ত দ্বার। তিনি তথ্যপ্রযুক্তিতে নারীর অগ্রগতি উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। কারণ এ যুগে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়া নারীর উন্নয়ন সম্ভব না। এক্ষেত্রে নারীকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে তথ্যপ্রযুক্তিতে অনগ্রসর রেখে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্র হতে পারবে না এবং নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়নও সম্ভব নয়। তৃণমূল নারীদের মাঝে তথ্যসেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার ৫৪৪ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের এক কোটি গ্রামীণ নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন করা হবে।

নারীদের স্বাস্থ্যের দিকেও যেন সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। যার ফলে গ্রামীণ নারীর সুবিধার্থে গড়ে উঠেছে বহু কমিউনিটি ক্লিনিক। সুতরাং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানো ও জন্মহার অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সুদৃষ্টির জন্যেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ও চাকরিতেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে নারীদের। যার ফলে উন্নয়ন হচ্ছে দেশ ও জাতির। নারীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্যে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের একটি রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। উচ্চ কিংবা নিম্ন আদালতেও আসীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিচারক। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশ সহজ করতে ইউনিয়নভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন করে নারী উদ্যোক্তাও। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ডে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানাভাবে নারীদের অনুপ্রেরণা প্রদান করছেন। এতে নারীরা তাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে শিখেছে। গড়ে তুলেছেন নিজেদের পরিচয়।

আফরোজা তালুকদার: প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ

ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের আশ্রয়

নাজনীন সুলতানা নীতি

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ভয়াবহ সংকট শরণার্থী সমস্যা। মনুষ্য সৃষ্ট এ দুর্যোগ আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাপটে দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক শতাংশ আজ শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে, যার সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি। সাধারণভাবে, নির্যাতনের শিকার বা বিপজ্জনক রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বেসামরিক সংঘাতজনিত পরিস্থিতিতে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য কোনো ভূখণ্ড বা দেশে নিরাপত্তার জন্য আশ্রয়প্রার্থী হলে তাদের শরণার্থী বলা হয়। ১৯৫১ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক শরণার্থীদের মর্যাদা বিষয়ক সম্মেলনে অনুচ্ছেদ ১(এ)-তে সংক্ষিপ্ত আকারে শরণার্থীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, একজন ব্যক্তি যদি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন ও দেখতে পান যে, তিনি জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উন্মাদনা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক আদর্শ, সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর সদস্য হওয়ায় তাকে ঐ দেশের নাগরিকের অধিকার থেকে দূরে সরানো হচ্ছে, সেখানে ব্যাপক ভয়-ভীতিকর পরিবেশ বিদ্যমান এবং রাষ্ট্র তাকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন তিনি শরণার্থী বলে বিবেচিত হবেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম শরণার্থী সমস্যার আবির্ভাব হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। এসময় দেশভাগের ফলে সৃষ্ট ভারত ও নবগঠিত পাকিস্তানের মধ্যকার রাজনৈতিক উত্তেজনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পূর্ব বাংলা। এ অঞ্চলের অধিক জনসংখ্যা ও দুর্বল অর্থনীতির ওপর দেশভাগজনিত শরণার্থীদের প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল।

এরপর দ্বিতীয়বারের মতো শরণার্থী সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নির্বাচন-পরবর্তী ক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু মার্চ মাসে পরিস্থিতি দ্রুত এমনভাবে পরিবর্তিত হয়, যার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের কাছে এই যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে তা ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এজন্য সব ধরনের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তারা এই আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করে। কার্যত এই অভিযান পরিণত হয় বেসামরিক জনগণের ওপর গণহত্যা ও নির্যাতনের অভিযানে। রাষ্ট্রীয় এই গণহত্যা ও নির্যাতনের ফলে নতুন এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি হিসেবে সৃষ্টি হয় শরণার্থী সমস্যা। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মাত্র আট মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণের এক মাসের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে। মে মাসের শেষ নাগাদ ভারতে প্রবেশকৃত দৈনিক গড় শরণার্থীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষেরও বেশি এবং তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৪০ লক্ষ। জাতিসংঘকে প্রদত্ত ভারত সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের শেষে মোট শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি। উল্লেখ্য, এই শরণার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ, সংখ্যা প্রায় ৭০ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের ব্যয়ভার বহনের জন্য ভারতকে বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়েছিল; সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ২৬০ কোটি টাকা। অক্টোবরের দিকে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ফলে পরিস্থিতি সামলাতে ৭০০

মিলিয়ন রুপির অতিরিক্ত করারোপের রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্সও জারি করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসকদের চোখে শরণার্থী ছিল ভারতের শত্রুতাবশত একটি রাজনৈতিক কূটকৌশল। তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানালে জেনারেল ইয়াহিয়ার বক্তব্য ছিল– পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার জন্য ভারত পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালিদের চলে আসার জন্য প্রলুব্ধ করছে। অবস্থা স্বাভাবিক, সুতরাং তাদের ফিরে আসা উচিত।

শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৪৭ সালের পর আর কখনও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এত মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করেনি। এর দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল:

প্রথমত, বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ছিল পাকিস্তানের পরাজয় ও মুক্তিযুদ্ধের জয়। যে কারণে ভারত এর দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ভারতের পক্ষে শরণার্থীর চাপ সহ্য করা সম্ভব হতো না এবং স্থায়ীভাবে সীমান্তে বিপুল শরণার্থী রাখাও সম্ভব ছিল না। ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার সমান ছিল বাঙালি শরণার্থীর সংখ্যা। ভারত সরকারকে প্রতিদিন দুই কোটি টাকা শরণার্থীদের জন্য ব্যয় করতে হতো।

দ্বিতীয়ত, প্রতিনিয়ত শরণার্থীরা সীমান্ত পাড়ি দেওয়ায় পাকিস্তান একথা প্রমাণ করতে পারছিল না যে, দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। ফলে বিশ্ব জনমত তার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয়নি। আর এই শরণার্থী সমস্যাকে প্রধান করে তুলেই ভারত বিশ্ব জনমতকে নিজের পক্ষে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

শরণার্থীদের অধিকাংশ আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায়। এছাড়া আসাম, মেঘালয়, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশেও অনেকে আশ্রয় নেন। সেখানে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রতি সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। উভয় অঞ্চলের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক মিলও ছিল। তবে একথা সত্য, ভারত সরকার, ভারতীয় জনগণ, প্রবাসী বাঙালি, জাতিসংঘ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে শরণার্থীদের সাহায্যে এগিয়ে না আসলে ভারত একা এ ভার বহন করতে পারত না এবং আরও অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করতেন।

বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ তহবিল গঠনের লক্ষ্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে পণ্ডিত রবি শঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনের বিটলস সংগীত দলের সদস্যদের যৌথ আয়োজনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে জর্জ হ্যারিসন স্বরচিত 'বাংলাদেশ... ও বাংলাদেশ' গানটি পরিবেশন করেন। 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' প্রসঙ্গে পণ্ডিত রবি শঙ্কর বলেন, প্রতিদিন টানা দুটো শো হতো আমাদের, একটি ম্যাটিনি, অন্যটি সন্ধ্যাবেলায়। প্রতিটি শোতেই হাজার বিশেকেরও বেশি দর্শক সমাগত হতো। সন্তোষজনক অর্জিত টাকা ইউনিসেফ পরিচালিত বাংলাদেশি শরণার্থীদের সাহায্য তহবিলে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিষয় হচ্ছে, এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'বাংলাদেশ' নামটি রাতারাতি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীশিবির থেকে গঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী সংগ্রাম পরিষদ। এ দলে যুক্ত ছিলেন ওয়াহিদুল হক, সানজিদা খাতুন, মুস্তাফা মনোয়ার, সৈয়দ হাসান ইমাম প্রমুখ। তাঁরা গান গেয়ে, আবৃত্তি করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর শরণার্থীরা দেশে ফেরা শুরু করেছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর যারা ভারতে প্রবেশ করেছে তাদেরকে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ভারত সরকার। তবে ১০ মিলিয়ন শরণার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণের বন্দোবস্ত করা ছিল খুবই দুরূহ। তারপরও বৈরী পরিস্থিতির অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরণার্থীরা স্বেচ্ছায় বা স্বীয় উদ্যোগে বাড়ি ফিরতে শুরু করে। এমনকি যুদ্ধ চলাকালেও কেউ কেউ দেশে ফিরে আসে। ফেরার সময় শরণার্থীদের যাত্রাপথে খাবার, মেডিকেল সহায়তা এবং দুই সপ্তাহের প্রাথমিক রেশন প্রদান করা হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এর মধ্যেই নয় মিলিয়নেরও বেশি শরণার্থী দেশে ফিরে এসেছিল। নানাবিধ বাস্তব সমস্যা সত্ত্বেও স্বদেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষাই শরণার্থীদের জন্য মুখ্য বিষয় ছিল। বাংলাদেশের দ্রুত স্বাধীনতা লাভ গণহারে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে আরও সহজতর করে তোলে।

নাজনীন সুলতানা নীতি: শিক্ষক, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি

বঙ্গবন্ধু সেলের দুজন কারারক্ষীর সাক্ষাৎকার

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক জীবনের বেশির ভাগ সময় জেলে ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। বগুড়া জেলার দুজন (অবসরপ্রাপ্ত) কারারক্ষী বঙ্গবন্ধুর সেলে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রয়েছে তাঁদের মধুরস্মৃতি। আবু বকর সিদ্দিক দায়িত্ব পালনকালে বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। ৭৮ বছর বয়সি আবু বকর স্মৃতির মণিকোঠা থেকে স্মৃতিচারণ করেন। বগুড়া জেলার আব্দুর রহমান ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে যোগ দেন কারারক্ষী পদে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হয়ে এই কারাগারে আসেন। বঙ্গবন্ধুর ডিভিশন সেলে ডিউটির সুবাদে আব্দুর রহমান বঙ্গবন্ধুকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। ৮১ বছর বয়সি আব্দুর রহমান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। উন্নয়নকর্মী কে জী এম ফারুক তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী কে জী এম ফারুক একজন উন্নয়নকর্মী, সংগঠক, প্রগতিশীল ও অদম্যব্যক্তিত্ব। তিনি ৩রা এপ্রিল ২০১৮ বগুড়ার গাবতলী উপজেলার হামিদপুর গ্রামে অবসরপ্রাপ্ত কারারক্ষী আবু বকর সিদ্দিকের সাক্ষাৎকার এবং ৭ই নভেম্বর ২০১৯ বগুড়া জেলার আরেক অবসরপ্রাপ্ত কারারক্ষী আব্দুর রহমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন।

কারারক্ষী (অব.) আবু বকর সিদ্দিক: ১৯৬৬ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারারক্ষী পদে যোগদান করি। ১৯৭২ সালে আমি রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলি হই। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমার দায়িত্ব পড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেলে। এক সপ্তাহ অন্তর ডিউটি পরিবর্তন হতো। পশ্চিমাদের শাসন, শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপগুলো পছন্দ করি। আমি বুঝি, শেখ সাহেব পশ্চিমাদের ভয় পেতেন না। কখনও তাঁকে চিন্তিত, ভীত বা হতাশ দেখিনি। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বাঘের মতো হুংকার দিতেন। কিন্তু বাঙালিদের ভালোবাসতেন ও স্নেহ করতেন।

বঙ্গবন্ধুকে যে পৃথক সেলে রাখা হতো, সেটা বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। বারান্দা ছিল। বারান্দায় একটা হেলান বেঞ্চ ও চেয়ার থাকত। এখানে বসে বঙ্গবন্ধু খবরের কাগজ পড়তেন। বঙ্গবন্ধু আমাকে হেলান বেঞ্চে বসাতেন। পাশে বসে গল্প করতেন, ভালো-মন্দ আলাপ করতেন। দেশের কৃষকের খবর নিতেন। সংসারের খবর নিতেন। কারও দুঃসংবাদ থাকলে সান্ত্বনা দিতেন, পরামর্শ দিতেন ও সহমর্মিতা জানাতেন। শেখ সাহেব আমাদের খাবারদাবার খেতে দিতেন। আমরা নিম্নকর্মচারী হলেও বুঝতে পারতাম যে, শেখ সাহেব বাঙালিদের দাবি আদায় ও উন্নতির জন্য রাজনীতি এবং আন্দোলন-সংগ্রাম করছেন।

শেখ সাহেব একটা করে মামলায় খালাস পেলে আমরা খুশি হতাম। আমি ৭ই মার্চের ভাষণ শুনেছি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে উন্মত্ত জনতা কারাফটক আক্রমণ করলে জীবন বাঁচাতে বন্দিদের পালিয়ে যেতে কারাকর্মচারীরা সহায়তা করি।

শেখ সাহেব কারাগারের অফিসার ও কারারক্ষীদের ভালোবাসতেন। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী জেলখানার দক্ষ অফিসারদের পদোন্নতি দিয়ে আইজি, ডিআইজি ও সুপারিনটেন্ডেন্ট নিয়োগ চালু করেন। কারারক্ষীদের সুবিধা বাড়ানো হয়। আরও অনেক উন্নয়নের কাজ হাতে নেন। আমি আল্লাহর নিকট বঙ্গবন্ধুর বেহেশত নসিব কামনা করি।

কারারক্ষী (অব.) আব্দুর রহমান: শেখ সাহেব বড়ো নেতা, পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষকে ভালোবাসতেন। আমরা তাঁর ভয়ে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম। তিনি সেলের মধ্যে ডেকে নিতেন। তাঁর সেলের মধ্যে আমাকে চেয়ারে বসাতেন। তিনি নাশতা খেতে দিতেন। পাউরুটি, জেলি, কলা ও চা খাওয়াতেন। তিনি সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি নামাজ পড়তেন। তিনি আমাদের সংসারের খোঁজখবর নিতেন। একদিন বঙ্গবন্ধু জানতে চান, আমি কত বেতন পাই। আমি বলি, ৭০ টাকা। এসব টাকা কী করি তা জানতে চান। আমি বলি, বাড়িতে ৫০ টাকা পাঠাই ও মেসে ২০ টাকা জমা দেই। এরপর বঙ্গবন্ধু আমাকে পরামর্শ দেন, বাড়িতে ৪০ টাকা পাঠাতে ও ১০ টাকা জমা রাখতে। এই মহান নেতার পরামর্শ অনুযায়ী আমি মাসে ১০ টাকা করে সঞ্চয় করি।

আমি ১৯৭১ সালে ঠাকুরগাঁও উপ-কারাগারে কর্মরত ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এপ্রিল মাসে ঠাকুরগাঁও প্রবেশ করে। একদিন গেটরক্ষীর ডিউটি করছিলাম, সকাল ১০/১১টার দিকে একটি রকেটসেল পড়ে কারাপ্রাঙ্গণের টিনশেড ব্যারাকের সামনে। আমি এসময় জেলগেটের তালা খুলে দিয়ে আসামিদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেই। কয়েকজন নারীসহ একশোর কাছাকাছি বন্দি ছাড়া পেয়ে চলে যায়। আমিও জীবনরক্ষার্থে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামে আশ্রয় নিই।

বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করি ও মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর বেহেশত নসিব প্রার্থনা করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে: কে জী এম ফারুক, উন্নয়নকর্মী ও সংগঠক

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট
কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ ও নারী

আনোয়ারা আজাদ

বাংলাদেশ শিশুকাল অতিক্রম করে চড়াই-উতরাই পার হয়ে এখন মধ্যবয়সি। ১৯৭১-এ জন্ম নেওয়া রাষ্ট্র, জন্ম নেওয়া শিশু, কিশোররা সব এখন মধ্যবয়সি। বয়োবৃদ্ধরা অনেকেই চলে গেছেন, বাকিরা অপেক্ষা করছেন। আজকের বাংলাদেশে সার্বিক মূল্যায়ন তারাই ভালো করতে পারবেন, বলতে পারবেন। কারণ সেকাল আর একাল দুটোই তাদের দেখা। মধ্যবয়সি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্যায়নের সময় এখন। স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মূল্যবোধের সঠিক পরিমাপ করার সময় এখনই।

মানুষকে ফেলে আসা অতীত আর বর্তমানকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে হয়। ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজেকে ও দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সামাজিকভাবে প্রস্তুত হতে হয়। নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমৃদ্ধ হতে হয়, তবেই একটি দেশ এগিয়ে যায়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মুখ থুবড়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিল না। তারপরেও নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে গেছে, এগিয়ে যাচ্ছে।

এখনকার প্রজন্মের আশা পূরণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সমাজের দায়িত্ব। এই সমাজের আগামীর ভবিষ্যৎ হলো আজকের প্রজন্ম। তাই এই প্রজন্মেরও এখন দায়িত্ব এই দেশকে একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া। তাদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সম্প্রীতি, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে তাদেরকেই।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার, নারীর সম্মান-মর্যাদাও একটি দেশের সঠিক মূল্যায়ন করতে ভূমিকা রাখে। সত্যি কথা বলতে কী, নারী শ্রমিক বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রের নানা জায়গায় নারীর বিচরণই শুধু নারীর ক্ষমতায়ন বোঝায় না, নারীর সঠিক মর্যাদা দেওয়াকেও ক্ষমতায়ন বোঝায়। বর্তমানে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও কিছু মানুষ এখনও আর্থসামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একত্রে কাজ করতে হবে– তবেই সুন্দর একটি সমাজ, সুন্দর একটি রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।

নারীর উন্নতি মানে দেশের উন্নতি। নারীর জাগরণ মানে দেশের জাগরণ। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের নাগরিক হিসেবে সমঅধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা এখন প্রায় সমান সমান। নারীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সামাজিক নির্মাণের মাধ্যমেই নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা জরুরি, যেখানে জনগণের সম্পদের মালিকানা বণ্টন থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকবে নারীর। মনে রাখতে হবে বেশির ভাগ পরিবার গড়ে ওঠে নারীর পরিচালনাতেই।

রাজনীতিতে পরিশীলিত, শিক্ষিত ও মার্জিত রাজনীতিবিদের প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে তাই নারী নেতৃত্বের বড্ড বেশি প্রয়োজন এখন। স্বাধীনতার শুরু থেকেই স্বাধীনতাবিরোধীরা বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে না নেওয়ার সুপরিকল্পিত কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রেখেছে নানা নামে, নানাভাবে। তাদের প্রতিহত করতে হলে দেশের রাজনীতির পরিবেশ আরও স্বচ্ছ করা জরুরি। যোগ্য নেতৃত্ব জরুরি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেই যোগ্যতা ধারণ করে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

দেশে দেশে সুশাসনের অভাবের কারণে মানবতা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। প্রতিটি রাষ্ট্রে সুশাসনের নিশ্চয়তা, জবাবদিহির নিশ্চয়তা থাকলে মানবতার জয় নিশ্চিত হয়। সুশাসনকে একটি দেশের উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদানকারী হিসেবে দেখা হয়। প্লেটোর *দি রিপাবলিক* গ্রন্থে প্রথম সুশাসনের ধারণা পাওয়া যায়। সুশাসন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে, উন্নয়ন ঘটায়। তৃতীয় বিশ্বে সুশাসনের গুরুত্ব অনেক বেশি হলেও এর অভাব লক্ষণীয়। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে সম্পদের স্বল্পতার কারণে যতটা নয় তার চেয়েও বেশি হলো অব্যবস্থাপনা ও রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি।

জাতিসংঘের মতে, সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন। সুশাসনকে বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। ম্যাককরনির মতে, সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়। মোদ্দাকথা, সুশাসন নাগরিকদের অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– রাজনৈতিক দল, সংসদ, আমলাতন্ত্র, নির্বাচন কমিশন প্রভৃতি যদি তাদের ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই সম্ভব। যে রাষ্ট্র যত বেশি সুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই রাষ্ট্র তত বেশি উন্নতির দিকে ধাবিত হয়। আসল কথা সুশাসন হলো একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সুশাসন বলতে গণতান্ত্রিক শাসন ও গণতান্ত্রিক সরকারকে বুঝিয়েছেন যা বাংলাদেশের জন্যও প্রযোজ্য।

পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের নারীর অগ্রগতি ও সাফল্যের অঙ্ক একেবারেই কম নয়। আমাদের নারীরা পাইলট হয়েছে, পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে, আর্মি অফিসার, পুলিশ অফিসার হয়েছে, ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো খেলায়ও অবাক করার মতো সাফল্য বয়ে এনেছে।

মানুষকে মানুষ হিসেবে না ভাবলে, বিভাজন তৈরি করে দিলে সমাজ, রাষ্ট্র কোনোভাবেই উপকৃত হবে না। অনেক কষ্টে অর্জিত এই স্বাধীনতা যেন কোনোভাবেই ব্যর্থ হয়ে না যায় সে চেষ্টা আমাদের সবাইকে করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের নিজের দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ববোধ তৈরি হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমাদের প্রত্যেককেই সজাগ থাকতে হবে, জেগে থাকতে হবে, ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। আর এই জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতে হবে আজকের প্রজন্মকে। কারণ আগামীর পৃথিবী তাদের জন্যই। তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। দেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্বও তাদের।

আনোয়ারা আজাদ: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল বাংলাদেশ

জাহানারা বেগম

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে জনবহুল বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকাণ্ড, বজ্রপাত এবং ভূমিধস আমাদের অতি পরিচিত দুর্যোগ। তাছাড়া সিসমিক জোনে অবস্থানের কারণে বড়ো ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা থেকেও আমারা ঝুঁকিমুক্ত নই। যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও জনসচেতনতা ও পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে নিরলসভাবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান রাজধানীর মিরপুরে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২২' উপলক্ষে 'ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগে দ্রুত উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অ্যাকোয়াটিক সি সার্চবোট, মেরিন রেস্কিউ বোট, মেগাফোন সাইরেনসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে। এ কার্যক্রম সহজ করার জন্য আরও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।

সরকার দেশে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত সময়োপযোগী আইন, বিধি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকি কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণে বর্তমান সরকার সক্ষম।

বর্তমানে দেশের যে-কোনোও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচির ওপর গুরুত্বারোপসহ সব উন্নয়ন কর্মসূচিতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি গাঙ্গেয় বদ্বীপ। একারণেই বাংলাদেশের অবস্থান দুর্যোগপ্রবণ এলাকায়। এজন্য সরকার ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' গ্রহণ করেছে। দুর্যোগে বিপদ সংকেত প্রচার, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ঝুঁকি হ্রাস প্রস্তুতি, নিরাপদ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন ইত্যাদি কার্যক্রমে সরকার তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় জনসচেতনতা এবং মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবিলা বিষয়ে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত দফতর সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং উপকূলীয় জেলাগুলোর সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্য থেকে ৫৬ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গঠন করার পাশাপাশি ৬২ হাজার প্রশিক্ষিত নগর স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্যোগের আগাম সতর্ক বার্তা ও দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা জানতে মোবাইলে ১০৯০ নম্বরে (টোল ফ্রি) আইভিআর পদ্ধতি চালু করেছে সরকার। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস, বজ্রপাত, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি দুর্যোগ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে সরকার।

বিগত বছরগুলোতে দেশে ১০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২৫৫টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ১৯,৯৬৮টি সেতু-কালভার্ট, ৩,১৪৬ কিমি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২২০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ৪২৩টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, ৬৬টি ত্রাণ গুদাম, ২৬৯২ কিমি. মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ৬৪৯১টি সেতু/কালভার্ট এবং ৫৫০টি মুজিব কিল্লা সংস্কার ও নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর ১০ই মার্চ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' হিসেবে দিনটি পালন করে আসছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে রোল মডেল। তারই ধারাবাহিকতা ও সাফল্য ধরে রাখার জন্য এবং জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ মোকাবিলায় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, সমাজকর্মীসহ সমাজের সবাইকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে, আধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের সকলেরই আন্তরিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তাহলেই আমরা অতি শীঘ্রই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

জাহানারা বেগম : প্রাবন্ধিক

বাবা আমার বিজয় ফুল

সুজন বড়ুয়া

২৬শে মার্চ ভোরবেলা। আচমকা দরজায় ব্যস্ত কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের।

সূর্যের ঘুম ভাঙেনি তখনও। চারপাশ হালকা কুয়াশায় ঢাকা। এর মাঝেই কাকগুলো অস্থির ডানা ঝাঁপটাচ্ছে আজ। সাধারণত এমনটা হয় না। কাকেরা প্রতিদিন আগে আগে জেগে ওঠে বটে, কোনো দালানের কার্নিস বা ল্যাম্পপোস্টের মাথায় বসে আড়মোড়া ভেঙে ঘুমের রেশ কাটায় চুপচাপ। এসময় পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা নিঃশব্দ পায়ে আপন মনে রাস্তাঘাট ও শৌচাগারের ময়লা আবর্জনা বর্জ্য সরিয়ে নেয়। পত্রিকার হকারদের চলে ব্যস্ত ছোটাছুটি। সাইকেল-রিকশার টুংটাং বেল বেজে ওঠে হঠাৎ। ক্রমে লোকজনের চলাচল বাড়তে থাকে। সবজি ফেরিওয়ালার 'আলু-বেগুন নেবেন' হাঁকডাক শুনতে শুনতে শহরের ঘুম ভাঙে। আমাদের মধুতন্দ্রা কাটতে থাকে। আমরা বিছানা ছাড়তে ছাড়তে সূর্য আকাশে আলোর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়।

গতরাতেও বরাবরের মতোই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমরা, মানে আমরা চার ভাইবোন– আমি শিমুল, ছোটোভাই শক্তি আর ছোটোবোন সুচরিতা ও সাগরিকা। বাবা-মা জেগেছিলেন অনেক রাত পর্যন্ত। বাবা বার বার বলছিলেন, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর আলোচনাটা ভেঙে গেল। বঙ্গবন্ধু তাঁর দাবিতে অনড়, সরকার গঠন করতে দিতে হবে। সবাই বলাবলি করছে, এবার একটা ফয়সালা হবে। শুনেছি, ইয়াহিয়া-ভুট্টো সন্ধ্যার আগে আগেই পাকিস্তান ফিরে গেছেন। এদিকে শহরের অবস্থাও ভালো নয়। ছাত্র-জনতা মিলে জায়গায় জায়গায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি জোয়ানরা ছাত্র-জনতার সঙ্গে নাকি হাত মিলিয়েছে। না জানি রাতে কী হয়! বলতে বলতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাবা।

বাবার আশঙ্কাই ঠিক। রাতেরবেলা আমরা গোলাগুলির অনেক বিকট শব্দ শুনতে পেয়েছি। ঘুমের মধ্যেও আমি কেঁপে কেঁপে

উঠেছি বার বার। তখন দেখেছি, বাবা ঘরে অস্থির পায়চারি করছেন। পরে হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে বাবা ঘুমঘুম চোখে এসে দরজা খুললেন। বাবার পেছন পেছন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি মা আর আমি। আমরা দেখি, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক। সবার উসকো খুসকো চেহারা। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ।

তিনজনই আমাদের খুব চেনা। পাড়াপ্রতিবেশী। জামাল চাচা, হাবীব ভাই আর অবিনাশ দাদা। জামাল চাচা আবার বাবার সহকর্মীও। অসম বয়সের তিনজন মানুষ। কিন্তু তিনজনের খুব মনের মিল। তিনজনই আবার বাবার প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী। বাবার কাছে তারা ব্যায়াম, পিটি শেখে। বাবা ছিলেন পাকিস্তান এয়ারফোর্সের সদস্য। স্বেচ্ছা অব্যাহতি নিয়ে বাবা পরে যোগ দেন চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টে। এখন বাবা সেখানেই কর্মরত। অফিস ছুটির পর বাবা পাড়ার এসব লোকজনের সঙ্গেই গল্প-আড্ডা করে সময় কাটান। ছোটোবড়ো সবার কাছেই বাবা সমান জনপ্রিয়। বাবাকে সবাই ভালোবাসে এটা ভাবতে আমার ভালো লাগে। পাড়ায় কিছু হলেই তারা ছুটে আসে বাবার কাছে। আজও এসেছে।

বাবা কিছু বলার আগেই জামাল চাচারা আমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। অন্যদিন ঘরে ঢুকে যেমন চেয়ারে-সোফায় বসেন, আজ আর তেমন বসলেন না কেউ। বসার ঘরে দাঁড়িয়েই নিচুস্বরে কথা শুরু করেন। জামাল চাচা বলেন, দাদা শুনেছেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন?

হাবীব ভাই বলেন, বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জেলায় জেলায় বার্তা পাঠিয়েছেন।

অবিনাশ দাদা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, গভীর রাতে শহরের জায়গায় জায়গায় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তার সাইক্লোস্টাইল কপি বিতরণ হয়েছে। আমি দেখেছি। রেডিও খুলে খবর শোনেন কাকা।

সবার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। সবাই যেন টগবগ করে ফুটছে। বাবাও কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। রেডিও আনতে দ্রুত পায়ে ছুটে যান ভেতরের ঘরে।

রেডিও নিয়ে ফিরে আসতেই জামাল চাচা আবার বলেন, শহরে গোলযোগ শুরু হয়ে গেছে। রাস্তাঘাটে লোকজন আতঙ্কে দিগ্‌বিদিক ছুটছে। ঢাকায় নাকি গত রাতে অনেক গোলাগুলি হয়েছে। পিলখানা ইপিআর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে নাকি পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে। অনেক লোক হতাহত হয়েছে।

বাবা রেডিও অন করে অস্থিরভাবে নব ঘুরাচ্ছিলেন। কোনো স্টেশন ধরতে পারছিলেন না।

জামাল চাচা এবার বলেন, দাদা, আমরা তো একটা কাজ করে ফেলেছি।

বাবা জানতে চান, কী কাজ?

–কদমতলী রেললাইনের মুখে বিহারিদের যে বন্দুকের দোকান আছে, আজ শেষ রাতে আমরা সেটা লুট করেছি। দোকানের সব অস্ত্রশস্ত্র আমরা টাইগারপাস পাহাড়ে সরিয়ে নিয়েছি। সেখানে মোজাম্মেলরা এখন অস্ত্রশস্ত্রগুলো পাহারা দিচ্ছে।

বাবা যেন এবার চমকে ওঠেন।

– সত্যি, বলেন কী জামাল ভাই! এ তো দারুণ কাজ করেছেন।

জামাল চাচা, হাবীব ভাই, অবিনাশ দাদা তিনজনই একটু নড়েচড়ে বসেন, যেন তারা মনে সাহস ফিরে পেলেন। জামাল চাচা আবার বলতে শুরু করেন, দাদা, আমরা জানি, বিহারি-পাঞ্জাবিরা এসব অস্ত্রশস্ত্র বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। আমরা এটা হতে দিতে পারি না। তাই বিহারির দোকান লুট করে ওগুলো সরিয়ে নিয়েছি। কিন্তু এসব অস্ত্র দিয়ে আমরা কী করব? আমরা তো এগুলোর ব্যবহার জানি না। আপনি এয়ারফোর্সে ছিলেন, আপনি এগুলো সম্পর্কে জানেন। আমাদের একটু বুদ্ধি-পরামর্শ দেন, একবার ওদিকে চলেন।

আমি আর মা ভেতরের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিলাম। এ ধরনের প্রস্তাবে বাবা অমত করার কথা নয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে বাবা সব সময় সোচ্চার। এর প্রতিবাদেই অল্প বয়সে এয়ারফোর্সের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফোর্সে বাঙালি সেনাদের ওপর বৈষম্য-নিপীড়ন মেনে নিতে পারছিলেন না। চাকরি ছেড়েও চূড়ান্ত মুক্তি পাননি। সর্বত্র একই অবস্থা। বাঙালিরা এবার ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। এবার যদি মুক্তি মেলে। কেমন এক আশার আলোয় যেন বাবার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাবা মার দিকে তাকান একবার।

বাবার বাইরে যাওয়ার জামাকাপড় হাতে নিয়েই দাঁড়িয়েছিলেন মা। এ যেন মার মৌন সম্মতি। বাবার কোনো কাজে মা কোনোদিন বাধা দেননি। মার গভীর বিশ্বাস, বাবা কোনো অন্যায় কাজে জড়াবেন না। দেশ ও মানুষের জন্য যা মঙ্গল বাবা শুধু তা-ই করবেন।

মার বাড়িয়ে দেওয়া জামাকাপড় পরে বাবা তৈরি হয়ে গেলেন দ্রুত। মা বলেন, সাবধানে যান, বুঝেশুনে কাজ করবেন।

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে জামাল চাচাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

দুই

বাবা বাসায় ফিরতে ফিরতে সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর। অফিসে যাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে। বাবা ফিরে আসতেই মা বলেন, অফিসে যাবেন না?

–আর অফিস! শহরের সব লোক তো এখন রাস্তায়। প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেছে। আমি একা অফিসে গিয়ে কী করব! বাবা জামাকাপড় পালটাতে পালটাতে মার দিকে তাকান। থমথমে চেহারা বাবার। তবে ভেতরে ভেতরে যেন উত্তেজনায় অধীর। খানিক থেমে দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন, ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাস্তায় রাস্তায় ট্যাঙ্ক নামিয়েছে। গণহত্যা শুরু করেছে, নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করছে। জয়দেবপুর, রাজশাহী, খুলনায় বাঙালি সেনারা রুখে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি জোয়ানরা বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। ছাত্র-জনতার সঙ্গে মিলে নাসিরাবাদ-ষোলশহর এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এখন কী যে হবে!

মা ভয়ে আতঙ্কে আগে থেকেই জড়োসড়ো। বাবার কথা শুনে এবার হাহাকার করে ওঠেন, হায় হায়, এ কী দুর্যোগ নেমে এল দেশে। এসব কী শুনতে পাচ্ছি! মা যেন ঝড়ো হাওয়ার কাঁপন লাগা একটি ঝাউগাছ। একটু সামলে নিয়ে আবার বলেন, কিন্তু আপনি যে কাজে গেলেন, তার কী হলো? অস্ত্রগুলো কী করলেন?

–অস্ত্রগুলো ওদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে এসেছি। কোনটা কীভাবে চালাতে হয়, কিছুক্ষণ তার তালিম দিলাম। তাইতো দেরি হলো।

আমি পড়ার টেবিলে বসেছিলাম। কিছুদিন ধরে আমারও স্কুল হচ্ছে না। হরতাল-আন্দোলন এসবে স্কুল টানা বন্ধ। আমি চট্টগ্রাম

কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ি। ছোটোভাই শক্তি পড়ে ক্লাস থ্রিতে, ছোটোবোন সুচরিতা পড়ে ক্লাস ওয়ানে আর সবার ছোটো সাগরিকা এখনো হাঁটতে শেখেনি। ও ঘুমাচ্ছে। শক্তি ও সুচরিতা বাসার সামনে পাড়ার ছোটো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলছে। আমি গতকালের পত্রিকাটা আবার উলটেপালটে দেখছি। আমার পড়ার টেবিল থেকে বাবা-মার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

বাবা অস্ত্রগুলো ওদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে এসেছেন শুনে মা মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু বাবাকে খোঁচা দেওয়ার সুযোগটা ছাড়েন না। কপট হতাশার সুরে বলেন, ওরা আপনাকে একটা অস্ত্রও কি দিলো না?

বাবাও কম যান না! মার খোঁচাটা বুঝতে পেরে ব্যাপারটাকে আরও রহস্যময় করে তোলেন। বলেন, সে কথা তোমাকে বলব কেন? গেরিলাযোদ্ধারা বউকেও সব কথা বলে না। –বলতে বলতে বাবা বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

বাবার কথা শুনে আমার সন্দেহ হলো। বাবা কি তবে নিজের কাছে কোনো অস্ত্র রেখেছেন?

তিন

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পুরো বদলে গেল শহরের দৃশ্যপট ।

বাবা বিকেলে একটু বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল শহরের অবস্থা দেখা আর নতুন কিছু খবর-বার্তা জানা। এছাড়া সদ্য খবর পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আজকের খবরের কাগজটাও পাওয়া যায়নি। বাসার রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে বাবা একবার মাত্র চট্টগ্রাম বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ধরতে পেরেছিলেন। এম এ হান্নান সাহেবের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটা শুনতে পেয়েছেন একবার। তারপর থেকে রেডিওটা কাজ করছে না আর। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

বাবা সন্ধ্যার মুখে মুখে বাসায় ফিরে এসে জানান ভয়াবহ খবর। বলেন, পাকিস্তানি সেনারা নাকি বঙ্গবন্ধুকে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে অস্ত্র-গোলা-বারুদ-কামান-ট্যাঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানি সেনারা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। মানুষ শহর ছেড়ে পালাচ্ছে গ্রামেগঞ্জে। –বলতে বলতে বাবা অস্থির হয়ে ওঠেন।

বাবার কথা শুনে মা ছটফট করতে করতে বলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তবে আমি একটু দেখে আসি তো হাসি দিদি, নিমাইয়ের মা ওরা কী করছে। –বলতে বলতে পাশের বাসায় ছুটে গেলেন মা।

দশ মিনিটের মধ্যে আশপাশের দু-তিনটা বাসা ঘুরে মা ফিরে এলেন দ্রুত। প্রায় আর্তনাদ করে বলে ওঠেন, হায় হায়, আমাদের কী হবে এখন! সবাই তো যার যার গ্রামে চলে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সবাই ব্যাগ, বোঁচকা বেঁধে তৈরি। আমরাই কেবল বসে আছি চুপচাপ।

আমি মার দুর্ভাবনা কাটানোর জন্য বলি, কেন মা, তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন? আমাদের গ্রাম আছে না? গ্রামে আমাদের বাড়ি আছে। আমরাও গ্রামে চলে যাব।

বাবা পাশেই ছিলেন। আমার কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারেন না। –আরে, গ্রামে যাবটা কোন পথে? ষোলশহরের ওখানে তো ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে, পথে পথে যুদ্ধ চলছে। বাবার কণ্ঠে গভীর হতাশা। একটু চুপ থেকে নিজেই আবার বলে ওঠেন, তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এখন শহরে থাকা কিছুতেই নিরাপদ নয়। দরকার হলে ঘোরাপথেই আমরা গ্রামে যাব। আজ রাতেই তোমরা তৈরি হয়ে যাও। কাল সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

রাতের মধ্যেই আমরা তৈরি হয়ে গেলাম। মার সঙ্গে কাজে হাত লাগালাম আমরা সবাই। বাসা গুছিয়ে নিজেদের ব্যাগপত্র গোছগাছ করে নিলাম হাতে হাতে। বাবা বলেন, আমাদের নৌপথেই যেতে হবে।

বাবার কথা শুনে আমরা সবাই অবাক। নৌপথে ফটিকছড়ি যাওয়া যায় নাকি! ফটিকছড়ি থানার ছিলোনীয়া আমাদের গ্রাম। শহর থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে। রেল বা বাসে আমরা যাওয়া-আসা করি নিয়মিত। এখন রেল চলাচল বন্ধ। তাই বলে আগে কখনও আমরা নৌকা বা লঞ্চে গ্রামে যাইনি।

বাবা বলেন, এবার যেতে হবে। উপায় নেই। এখন সময় অন্যরকম। সড়কপথে পদে পদে বিপদ। ভেঙে ভেঙে হলেও নদী পথেই যেতে হবে। আমরা প্রথমে ট্যাক্সিতে করে মোগলটুলী থেকে আছাদগঞ্জের চাক্তাই যাব। চাক্তাই খালের ঘাট থেকে চড়ব সাম্পানে। কর্ণফুলি নদী হয়ে যাব মদুনাঘাট। সেখান থেকে নৌকায় হালদা নদী হয়ে যাব বিনাজুরীর ঘাটে। তারপর জিপ-রিকশা যা পাই, না পেলে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। তোমরা পথে সব রকম ধকলের জন্য তৈরি হয়ে যাও মনে মনে।

চার

আজ ২৭শে মার্চ। বাবার কথা মতোই কাজ হলো। ভোরবেলা বাসায় তালা লাগিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি গ্রামের উদ্দেশে।

সাম্পান নৌকা বেয়ে আমরা যখন বিনাজুরীর ঘাটে নামি, তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেল। তারপর শুরু হলো পায়ে হাঁটা। তিন মাইল হেঁটে পাওয়া গেল রিকশা। রিকশার পর আবার হাঁটা, আবার রিকশা। এর মাঝে মার হাতে তৈরি হালকা খাবার খাওয়া হলো বার বার। এভাবে সন্ধ্যার আগে আগে নাজিরহাট পৌঁছে তবেই স্বস্তি। এবার পাওয়া গেল জিপ গাড়ি। বাবা জিপ ভাড়া করেন আমাদের বাড়ি পর্যন্ত। নাজিরহাট থেকে যেতে হবে রামগড় রোড ধরে। রামগড় রোড গেছে আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে। এই রামগড় রোডের পাশেই আমাদের বাড়ি। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে রাতের আঁধারে ছেয়ে গেল চারপাশ। এর মাঝে বাড়ির গেটে এসে দাঁড়ায় আমাদের জিপ গাড়ি। গাড়ির হর্ন শুনে গেট খুলে দিলো আমাদের পুরোনো কাজের লোক নকুল। নকুলের হাঁকডাকে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সবাই।

আমাদের বাড়িটা বেশ বড়ো। আমার বাবারা চার ভাই। তিন ভাই থাকেন পূর্ব পাকিস্তানে। এক ভাই ভারতের শিলিগুড়িতে। তিনি মেজো ভাই হিমাংশু। বড়ো সুধাংশু, সেজো ভবেশচন্দ্র আর সবার ছোটো আশুতোষ। আমার বাবা ভবেশচন্দ্র। আমরা এখনও যৌথ পরিবার। জ্যাঠা-কাকা সবাই আমরা এক বাড়িতেই থাকি। সব মিলিয়ে আমরা বারোজন ভাইবোন। সবার আনন্দ-বেদনা আমরা ভাগ করে নিই একসঙ্গে। সুতরাং এই দুর্যোগের দিনে আমাদের বাড়ি আসার খবরে সবাই আন্দোলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আমাদের বুকে জড়িয়ে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সবাই, যেন এবার সবার দুশ্চিন্তার অবসান হলো। কারণ আমরাই সবার শেষে বাড়ি ফিরলাম। ছোটো কাকা আর বড়ো জ্যাঠার দুই ছেলে, যারা বাইরে থাকতেন তারাও আমাদের আগে বাড়ি ফিরে এসেছে। এবার আমরা ফিরে আসায় বাড়িটা আনন্দে একেবারে গমগম করে উঠল। কিন্তু রাতেরবেলা আমরা বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারলাম না। ক্লান্তিতে শরীর নেতিয়ে পড়ছিল। রাতের খাবার খেয়ে সবাই

বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম গ্রামের অবস্থাও প্রায় শহরের মতো। ঘরে ঘরে সব নতুন মুখ, নতুন মানুষ। তফাৎ শুধু শহরের মতো গ্রামের মানুষের মনে তেমন ভয়-আতঙ্ক বাসা বাঁধেনি। শহরের মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে গ্রাম। আমাদের মতো অনেকেই শহরের বাসাবাড়ি ছেড়ে ফিরে এসেছে গ্রামে। সবাই এখন ভাবছে গ্রামই শেষ আশ্রয়।

আমাদের গ্রামটাও এক মজার জায়গা। এটি মূলত বৌদ্ধ গ্রাম। তবে পাশেই মুসলিম বসতি। প্রতিবেশী মুসলিমদের সঙ্গেও আমাদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা। সমবয়সি মুসলিম ছেলেদের সঙ্গে আমরা নিয়মিত খেলাধুলা করি। আমি গ্রামে এলে সবার আনন্দ যেন আরও বেড়ে যায়। আমাদের গ্রামের আত্মীয় জ্ঞাতি উত্তম, চন্দন, মিঠু, দুকুল, শ্যামল, টুটু, রূপন, ঝন্টু, পিন্টু, মৃদুল যেমন, তেমনি মুসলিম প্রতিবেশী দিদার, রফিক, আহমদ, মনির, আলম, খোরশেদ, আলী ওরাও আমাদের খেলার প্রিয় সঙ্গী।

চট্টগ্রাম শহর থেকে রামগড় রোড এসেছে হাটহাজারী, নাজিরহাট, বিবিরহাট পেরিয়ে। তারপর ধুরং নদীর পাকা সেতুর ওপর দিয়ে এসে আমাদের গ্রামকে দুভাগ করে রামগড় রোড সোজা উত্তরে চলে গেছে ভারতের সীমান্তের দিকে। সীমান্ত শেষে সাবরুম বর্ডার। এই রামগড় রোডের পূর্ব পাশে আমাদের বাড়ি। গ্রামের বৌদ্ধ বসতির সিংহভাগ পড়েছে রোডের পশ্চিম পাশে। ওদিকটায় বসতির পর অবারিত ধানিজমি। আমরা বলি ছিলোনীয়ার বিল। আমাদের বাড়ির সামনে রামগড় রোডের ঠিক পশ্চিম পাশে বৌদ্ধ বিহার। বিহারের সঙ্গে লাগোয়া পশ্চিম পাশেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের মাঠে আমরা যেমন খেলাধুলা করি, তেমনি আবার কখনো পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন মাসে আমরা খেলি ছিলোনীয়ার ফাঁকা বিলে। এখন চৈত্র মাস। আমন ধান কাটার পর ছিলোনীয়া বিলের বেশ কিছু জমি এখনো ফাঁকা। সেই ফাঁকা মাঠে কদিন ফুটবল, দাঁড়িয়াবান্ধা, ডাংগুলি খেলে বেশ কাটালাম আমরা।

আর বাবার সময় কাটছে গ্রামে এদিক-ওদিক ঘুরে, এর-ওর সঙ্গে কুশল বিনিময় করে। আমাদের স্কুল শিক্ষক জ্যাঠামণির স্কুল তো সেই কবে থেকে বন্ধ। সকাল-সন্ধ্যে জ্যাঠা-কাকা-বাবা তিনজন মিলে বসেন রেডিও নিয়ে। চা-নাশতা খেতে খেতে তাদের সলা-আলাপ চলে অনেকক্ষণ। তাদেরও সময় কাটে অলস কর্মহীন। তবে বাড়ির সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ মা-জ্যাঠি-কাকিরা। আমরা এতগুলো মানুষের তিন-চারবেলা খাবারের আয়োজন করেই দিন কাটে তাদের। এ কাজে তাদের কোনো ক্লান্তি নেই। মুখে সদাই উপচে পড়ছে হাসি। যেন আমাদের খাওয়াতে পেরেই তারা ধন্য। অবশ্য ফাইফরমাশ খাটার জন্য তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে জ্যোৎস্নাদিদি। যেখানে কাজ সেখানেই জ্যোৎস্নাদিদি হাজির। তাই আমরা তাকে ডাকি 'চরকিদিদি' বলে।

কিন্তু এমন হেলেদুলে হেসেখেলে বেশি দিন কাটল না আমাদের। গ্রামের জীবনধারাও পালটে গেল দেখতে দেখতে। শহরের মতো গ্রামেও লেগে গেল লোকজনের ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি। আমাদের রামগড় রোড ধরে উত্তরমুখী লোক চলাচল বেড়ে যেতে লাগল দিন দিন। গাড়ি-ঘোড়ার আর বালাই নেই। সব পায়ে হাঁটা লোক। ছেলেমেয়ে, নারী-পুরুষ, জোয়ান-বৃদ্ধ চলেছে পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে। কারো মাথায় ভারী বোঝা, কারো দুহাতে বোঁচকা, গাঁটরি। কেউ কেউ হাঁটছে অতি বয়োবৃদ্ধ পিতামাতাকে কোলে পিঠে তুলে নিয়ে। আমরা যত দেখি ততই অবাক হই। কেন এমনটা হচ্ছে, এরা যাচ্ছেই-বা কোথায়, কেনই-বা যাচ্ছে এভাবে!

বাবা সহসাই নিবৃত্ত করলেন আমাদের এই কৌতূহল। আমরা খেলতে যাব বলে আমাদের সামনের পুকুরের শানবাঁধানো ঘাটে দল পাকাচ্ছিলাম। আমরা ছোটো-বড়ো দশজনের মতো জড়ো হয়েছি। এমন সময় বাবা সেখানে উপস্থিত। আমাদের বলেন, আজ তোমরা একটু পরে খেলতে যাবে। আমি একটু কথা বলি, শুনে যাও। তোমরা সবাই শানবাঁধানো ঘাটে বসো।

আমরা ছোটোরা সবাই ঘাটের মেঝেতে আর একটু বড়োরা পশ্চিম পাশের শানবাঁধানো টুলে বসে পড়ি। বাবা একা বসেন পূর্ব পাশের টুলটায়। চৈত্র মাসের বিকেল। পশ্চিমাকাশে উজ্জ্বল সূর্য। পাশের আমগাছটা নিবিড় ছায়া বিছিয়ে দিয়েছে আমাদের মাথার ওপর। বসন্ত বাতাস বিলি কেটে যাচ্ছে আমাদের গায়ে। ঢেউয়ের মালা বুনছে পুকুরের শান্ত জল। আমরা আনমনা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি।

বাবা বলেন, তোমরা সবাই আমার দিকে তাকাও। তোমরা তো দেখেছ, আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অনেক লোক উত্তর দিকে যাচ্ছে। তোমরা কি জানো, ওরা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে?

আমরা কেউ কিছু বলছি না, চুপচাপ বসে আছি। বাবা আবার বলে চলেন, আচ্ছা তোমরা বলো তো তোমাদের স্কুল-কলেজ বন্ধ কেন? আমাদের অফিস-আদালত বন্ধ কেন?

আমরা এবারও কিছু বলি না। এ ওর মুখের দিকে তাকাই। বাবা আবার বলে ওঠেন, আচ্ছা তোমরা আমাদের দেশ সম্পর্কে কী জানো?

আমাদের নীহার দাদা, বড়ো জ্যাঠার মেজো ছেলে, যাকে আমরা 'মেজদা' বলে ডাকি, তিনি এখানে সবার বড়ো, কলেজে পড়েন। তিনি এবার বলে ওঠেন, আমাদের তো দেশই নেই কাকা, এখন দেশ স্বাধীনের জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা এখনো পরাধীন জাতি।

বাবার চোখ মুখ এবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভেতরে ভেতরে যেন বেশ উৎসাহ বোধ করেন তিনি। বলেন, হ্যাঁ, তোমাদের কাছ থেকে এটাই শুনতে চাচ্ছিলাম। এই যে এত ওলটপালট, এত দুর্যোগ, দুর্ভোগ, এসবের মূল কারণ যুদ্ধ, স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমাদের এই 'পূর্ব পাকিস্তান' পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রদেশ মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের শাসন করে এক হাজার মাইল দূরে বসে। চব্বিশ বছর ধরে শাসনের নামে নানাভাবে আমাদের শোষণ নিপীড়ন অত্যাচার করে চলেছে তারা। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পরও পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাঁকে সরকার গঠন করতে দেয়নি। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তান হবে বাংলাদেশ। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তানিরা আমাদের স্বাধীনতা দেবে না। তাই যুদ্ধ শুরু হয়েছে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। তোমরা জানো, আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি দেশ আছে, সে দেশের নাম ভারত। ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ। এই ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এসেছে। পাকিস্তানিরা তাই এ দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার, অনাচার শুরু করেছে। বেছে বেছে এ দেশের হিন্দুদের হত্যা করছে। হিন্দুরা নিরুপায় হয়ে তাদের ঘরবাড়ি, ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। এরা শরণার্থী। এরা সবাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

আমার কাছে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুতুড়ে মনে হলো। ভারত আমাদের সমর্থন দিতেই পারে। তাই বলে স্বাধীনতার যুদ্ধে কেন ধর্মকে টেনে আনা হচ্ছে? স্বাধীনতা তো সবার জন্য। দেশের সব ধর্মের মানুষ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দলকে ভোট দিয়েছে। সেখানে কেন শুধু

হিন্দু ধর্মের লোকদের শাস্তি পেতে হবে? আমি ভেতরে ভেতরে তড়পাতে থাকি। আমি বাবাকে বলি, এটা কেমন হলো বাবা? এই যুদ্ধে শুধু হিন্দুরাই কেন শাস্তি পাবে?

বাবা বলেন, এটা ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের পুরোনো শত্রুতা। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত পাকিস্তান দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। এতদিন পর সুযোগ পেয়ে পাকিস্তান সেই ধর্মকেই আবার কাজে লাগাচ্ছে। এখানকার হিন্দুদের ভারতে ঠেলে দিচ্ছে। এটা নিষ্ঠুর ও অমানবিক কাজ। মিঠু হাত তুলে বাবার দিকে তাকায়।

– কাকা, আমার একটি প্রশ্ন, এসময় হিন্দুরা যদি থাকতে না পারে, আমরা বৌদ্ধরা কী করে এখানে থাকব? পাকিস্তানি সেনারা কি আমাদের ওপর অত্যাচার করবে না?

বাবা এবার স্মিত হাসেন, এটা খুব মজার প্রসঙ্গরে। এখানেও ধর্মটাই মুখ্য। তোমরা নিশ্চয় চীন দেশের নাম শুনেছ। এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীন, বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। এই চীন দেশের প্রধান ধর্ম কিন্তু বৌদ্ধ। আর চীন দেশ এই যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছে, অস্ত্র-গোলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য করছে। তাই পাকিস্তান সরকার বৌদ্ধদের ওপর কিছুটা সহানুভূতিশীল। এখানে তোমরা একটা বিষয় ভেবে দেখ, যে ধর্মের কারণে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, সেই ধর্মের সুযোগেই আমরা দেশে থাকতে পারছি। একেই বলে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ! যাহোক, আশা করি আমরা 'চায়না বুড্ডিস্ট' পরিচয়ে এখানে থেকে যেতে পারব। আমাদের তেমন অসুবিধা হবে না। তাই বলে আমরা কিন্তু পাকিস্তানকে সমর্থন করব না। আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করব। তোমরা মনে রেখো, এ যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হবে না। পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। এখানকার পাকিস্তানি সেনারা শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো, এখানেও সেনারা আসবে, তাতে কোনো ভুল নেই।

চন্দন ভয়মাখা মুখে উঠে দাঁড়ায়।

–কাকা, এখানে যদি পাকিস্তানি মিলিটারি আসে আমরা কীভাবে বাঁচব?

বাবা বলেন, এখনই তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমরা হয়ত জানো না, আমাদের তরুণ জোয়ান ছেলেরা ভেতরে ভেতরে ভারতে চলে যাচ্ছে যুদ্ধের ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। ওখানে ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হচ্ছে। সবাই তো আর ভারতে যেতে পারবে না, যাওয়ার দরকারও নেই। সবাইকে সরাসরি যুদ্ধ করতে হবে এমন নয়। দেশে থেকেও স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজ করা যাবে। আমি মাঝে মাঝে তোমাদের সেই ট্রেনিং দেব। সেটা পরের ব্যাপার। এখন একটি জরুরি কাজ করার আছে। এই যে আমাদের গ্রামের ওপর দিয়ে প্রতিদিন এত এত শরণার্থী যাচ্ছে, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় পথে ওদের কত কষ্ট! রোদ-বৃষ্টিতে একটু বিশ্রামেরও ব্যবস্থা কোথাও নেই। আমরা কি ওদের পাশে দাঁড়াতে পারি না? মানুষ হিসেবে ওদের জন্য আমাদের তো কিছু করা উচিত। আমি চাই, তোমরাও এ কাজে এগিয়ে আসো, তোমরা কিছু করো।

শ্যামল দাঁড়িয়ে বলে, আমরা কী করব কাকা? আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন।

বাবা এবার বলেন, হ্যাঁ, তাই বলছি। আমি চাই, তোমরা কাল সকাল থেকে শরণার্থীদের চিড়া-মুড়ি-গুড় খাওয়াবে, শরবত-জল খাওয়াবে। আজই তোমরা আমাদের গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিড়া-মুড়ি-গুড় চিনি ভিক্ষা করে আনো, মুষ্টিভিক্ষা যেভাবে তোলে, সেইভাবে। যা পাবে, তা-ই দিয়ে কাল সকালে কাজ শুরু করবে। বাকিটা আমরা বড়োরা দেখব।

পাঁচ

আজ সকালটা আমাদের জন্য এক অন্যরকম আনন্দ নিয়ে এলো। আশ্রয়হীন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবার আনন্দ।

গতকাল বিকেল থেকেই আমরা এ আনন্দ অনুভব করছিলাম। বাবার কথামতো কাল যখন বাড়ি বাড়ি চিড়া-মুড়ি-গুড়-চিনি চাইতে গিয়েছিলাম, কেউই আমাদের ফেরায়নি। সবাই আমাদের কিছু না কিছু দিয়েছে। বাড়ির কাকি-মামি-মাসি-পিসিরা খুশিমনে মমতা নিয়ে বলেছে, আহারে বাছারা, কত পুণ্যের একটি কাজ তোমরা শুরু করলে। তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও একটু রেখো। আমরা না হয় ঘরের ভেতরে থেকে চিড়া-মুড়ি-গুড়-চিনি-শরবত বানিয়ে দেব, তৈরি করে এগিয়ে বাড়িয়ে দেব, তোমরা বাইরে বিতরণ করবে। তখন হাসি-ঠাট্টার ছলে কথা হলেও সকালে তা আর কথার কথা রইল না। বাস্তবে দেখা গেল একজন দুজন করে মাসি-পিসি-দিদিমা আমাদের বিহারে এসে হাজির হচ্ছেন। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বিহার থেকে শরণার্থীদের আপ্যায়ন-সেবার কাজ পরিচালনা করা হবে।

আজ সকালেই আমরা দেখি, আমাদের বিহারের উঠোনে শামিয়ানা খাটিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে। প্যান্ডেলের নিচে সারি সারি মাদুর পাতা। পথচারী অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি মাইকেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্যান্ডেলের ছায়ায় বসে খানিক বিশ্রাম নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের রীতিমতো আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে মাইকে। এই ঘোষণা প্রচারের ভার দেওয়া হয়েছে বড়ো জ্যাঠার ছেলে, আমাদের গুড়াদা মানে বুলুদাকে।

ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক পথচারীরা প্যান্ডেলের মধ্যে এসে বসতে শুরু করল। আমরা তাদের আতিথেয়তা-আপ্যায়নে লেগে গেলাম। আমাদের কেউ কেউ অভ্যাগত অতিথিদের সারি করে বসাচ্ছে। কারো হাতে শরবতের জগ-গ্লাস, কারো হাতে খাবার জলের জগ। কেউ পাশের চাপাকল থেকে বালতি, কলসি ভরে নিয়ে আনছে খাবার জল। কেউ করছে চিড়া-কলা খাওয়ানোর আয়োজন। কেউ-বা দিচ্ছে গুড়-মুড়ি। উৎসাহী কাকি-মামি-মাসি-পিসিরা গামলা-ডেকচি সাজিয়ে শরবত বানাচ্ছে আর চিড়া ভিজাচ্ছে। বিহারাধ্যক্ষ প্রজ্ঞালোক ভান্তে তার জমানো চা-চিনি বিস্কুটের ভাণ্ড উজাড় করে দিলেন। বাবাসহ গ্রামের জ্যাঠা-কাকা-মামারা বাইরে ঘুরে ঘুরে শৃঙ্খলার দিক দেখছেন আর তদারকি করছেন। এভাবেই চলল আমাদের শরণার্থী সেবা।

দিন দিন দক্ষিণ দিক থেকে যেন লোক আসা আরও বেড়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোর, ছেলেমেয়ে, জোয়ান-বুড়ো, নারী-পুরুষ, অন্ধ-খোঁড়া সবাই ছুটেছে বাক্স-প্যাঁটরা-বোঁচকা-গাঁট্টি নিয়ে। কেউ চলেছে কারো কোলে পিঠে চড়ে। সবার চোখে মুখে বাঁচার তীব্র আশা। কিন্তু অনেকেরই পেটে দানাপানি নেই। ক্ষুধায় কাতর তৃষ্ণায় মরমর। কারো কারো শরীর স্বাস্থ্য হাড্ডিচর্মসার। আমরা তাদের বাড়ি কোথায় জানতে চাই। কেউ বলে রাউজান হাটহাজারি, কেউ বলে আনোয়ারা বাঁশখালী। কেউ বলে চট্টগ্রাম শহরের হেম সেন লাইন, টেরিবাজার, বক্সীরহাট। কেউ কেউ বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, আমরা বাড়িভিটা ছেড়ে যেতে চাইনি। আমাদের সহায়সম্বল লুট করে নিয়ে গেছে স্থানীয় দুষ্কৃতকারীরা। আমাদের উদ্বাস্তু করেছে ওরা।

আমরা তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কোনো কথা বলার ভাষা খুঁজে পাই না। হায়রে মানুষ, প্রাণের ভয়ে সাজানো সংসার ফেলে ছুটে চলেছে অজানা গন্তব্যে!

কদিনেই দেখা গেল, আমাদের বিহারের উঠোনের প্যান্ডেলে আর জায়গা সংকুলান হয় না। পাশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও ঝটপট একটি প্যান্ডেল খাটানো হলো। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমরা প্রতিদিন সেবা দিতে থাকি বিরতিহীন।

এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহও কেটে গেল। এবার যেন ধীরে ধীরে কমে আসছে ঘরহারা ঘুমহারা মানুষের স্রোত। সেই সঙ্গে শোনা যেতে লাগল চরম কথাটি– গ্রামেও পাঞ্জাবি সৈন্য আসছে। আমাদের থানা সদরে সৈন্যরা এই পা রাখল বলে!

থানা সদর থেকে আমাদের গ্রাম দূরে নয়। রাস্তাঘাট ভালো, সোজা পথ। থানা সদরে আসা মানে আমাদের গ্রামে পা ফেলা। পাঞ্জাবি সৈন্যরা নিশ্চয় শরণার্থীদের সেবাদান ব্যবস্থা ভালো চোখে দেখবে না। তাই বিহার আর বিদ্যালয়ের মাঠের প্যান্ডেল দুটো খুলে ফেলা হলো দ্রুত। আমাদের প্রকাশ্যে শরণার্থী সেবাও বন্ধ হয়ে গেল।

বাবা এখন গোপনে আমাদের ছোটো ছোটো দল নিয়ে বসেন মাঝে মাঝে। বলেন, পাঞ্জাবি সৈন্যরা গ্রামে যদি আসে ভয় পাবে না। দৌড়ে পালাবে না। দৌড়ালে বিপদ হবে। স্বাভাবিক থাকবে। নিজে থেকে তোমরা কিছু বলবে না। ওরা কী করে তা ভালোভাবে খেয়াল করবে। পরে আমাকে এসে সব বলবে। এটাই তোমাদের মুক্তিযুদ্ধ। অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করাই কেবল যুদ্ধ না, ঘরে বসে তথ্য আদান-প্রদান করেও যুদ্ধে অংশ নেওয়া যায়। সৈন্যরা কিছু জানতে চাইলে আগেই নিজের পরিচয় দিয়ে নেবে। বলবে, 'হাম চায়না বুড্ডিস্ট হ্যায়'।

ছয়

চাপা বিলাপ জড়ানো এক চিকন কান্নার শব্দে আজ সকালে ঘুম ভাঙে আমাদের। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি জ্যাঠিমা কাঁদছেন। তড়িঘড়ি বিছানা ছেড়ে এসে দেখি, ভেতরের বারান্দার দুয়ারে বসে হাত-পা ছড়িয়ে শূন্যে মাথা টুকছেন জ্যাঠিমা। আর মুখে বিলাপ করছেন, আমার বুকের মানিক নীহার কোথায় গেলরে। রাতেরবেলা উঠে দেখি ও বিছানায় নাই। সকালেও আসে নাই। ওকে আমি কোথায় খুঁজে পাব?

জ্যাঠিমার কাছে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন বাবা। নিচু স্বরে বলেন, বৌদি, কেঁদো না। নীহার বড়ো হয়েছে, বুদ্ধিমান ছেলে, ও নিশ্চয় কোনো ভালো কাজে গেছে।

বাবার কথা শুনে জ্যাঠিমা আরও ঝাঁজিয়ে ওঠেন, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসো না। তুমিই আমার নীহারের মাথাটা খেয়েছ। ছেলেটা এখন কোথায় গিয়ে কোন বিপদে পড়ল, কে জানে! ও আমার নীহাররে।

জ্যাঠিমার রাগের ঝাঁজে বাবা পিছিয়ে এলেন একটু। খানিক সামলে নিয়ে আবার বলেন, তুমি শান্ত হও বৌদি। ওভাবে বলো না। বাইরের লোকে শুনতে পেলে সবার বিপদ হবে। এখন সময় খারাপ। মিলিটারিরা আমাদের গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। নীহার যেখানে থাকুক, যা-ই করুক ওসব এখন কাউকে বলা যাবে না। আমি জানি, নীহার ভালো থাকবে। নীহারের জন্য তুমি আশীর্বাদ করো।

বলতে বলতে বাবা সরে এলেন জ্যাঠিমার সামনে থেকে। ততক্ষণে বাড়ির সবাই এসে জড়ো হয়েছে ভেতরের বারান্দায়। বাবা আমাদের কামরার দিকে এগুতে এগুতে বলেন, তোমরা আজ বাইরে যেও-টেও না। সামনের বড়ো রাস্তার কানায় কানায় পাঞ্জাবি মিলিটারিরা পজিশন নিয়ে আছে। সবাই সাবধান।

আমরা আগে থেকেই কিছুটা গুটিয়ে ছিলাম। বাবার কথা শুনে আরও কুঁকড়ে গেলাম। কিন্তু একটি বিষয় কিছুতেই মাথা থেকে সরাতে পারি না আমি। নীহার দাদা মানে আমাদের মেজদা গেল কোথায়? বাবার কথায় মনে হচ্ছে বাবা জানেন, প্রকাশ্যে বলতে চান না। তবে কি মেজদা ভারতে চলে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেবে? ভাবতেই আমার শরীরে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। আহ্, মেজদা, জয়তু!

এই আনন্দ শিহরণের মধ্যে আরও একটি বিষয় আমাকে ভাবিয়ে তুলল। গ্রামে পাঞ্জাবি মিলিটারি এসেছে তা এত ভোরে বাবা জানলেন কী করে! বাবার কি সব বিষয় আগেই জানা হয়ে যায়?

ভাবতে ভাবতে মিলিটারিদের পজিশন দেখার কৌতূহল পেয়ে বসে আমাকে। আমাদের থাকার ঘরটা বাড়ির একবারে দক্ষিণ পাশে। ওদিকটায় আমাদের সব ধানিজমি। দূরে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে পূর্ব দিক থেকে এসে উত্তরে বাঁক নিয়েছে রামগড় রোড। মোড়ে দুটি চা ও মুদির দোকান। গ্রামের বেকার ও পথচারী লোকজন ওখানে বসে সময় কাটায়। আমি ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালার একটি পাল্লা আলতো ফাঁক করে রাস্তার বাঁক বরাবর তাকাই। আর অমনি চমকে উঠি নিজের অজান্তে। চা-মুদির দোকান আজ বন্ধ। পথঘাটে কোনো জনমানব নেই। শেখ আহমদের মুদির দোকানের পূর্ব পাশে রাস্তার ওপর পশ্চিমমুখী সারি করে দাঁড়ানো বেশ কটা জলপাই রঙের জিপ গাড়ি। এমন রঙের গাড়ি আমি আগে আর দেখিনি। একসঙ্গে প্রায় দশটা গাড়ি এখানে এসময় কারাই-বা নিয়ে এলো! তাহলে এগুলোই পাকিস্তানি সেনাদের গাড়ি! কিন্তু সেনারা গেল কোথায়? বাবা বললেন পজিশন নিয়েছে। সেটা কোথায়? আমি গাড়ির আশপাশে রাস্তার কানায় কানায় দৃষ্টি ঘোরাই। আমাদের সবুজ রাস্তার কানা কেমন অসমান এবড়োথেবড়ো লাগছে। আমি ভালো করে খেয়াল করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, রাস্তার ঘাসের সঙ্গে কারা যেন মিশে আছে উপুর হয়ে। মাথায় জলপাই রঙের হেলমেট ও গায়ে জলপাই রঙের পোশাক। প্রত্যেকের সামনে ওপরের দিকে আলগা করে যেন অস্ত্র তাক করা। এই বুঝি গুলি ছুঁড়বে! আমি ভয় পেয়ে জানালার পাল্লা ভেজিয়ে দিই। চুপচাপ সেঁধিয়ে থাকি ঘরে।

দুপুরের পর রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচল টের পেলাম। আবার জানালা খুলে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখি, জলপাই রঙের গাড়িগুলো আর নেই। রাস্তার পাশে পজিশন নেওয়া সেনারাও নেই। আমি এবার জানালাটা ভালোভাবে খুলে দিই, ভয় কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করি।

সাত

এরপর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই সীমিত হয়ে গেল আমাদের চলাচল। প্রায় গৃহবন্দি হয়ে কাটছে আমাদের দিন। গ্রামের রাস্তায় আর পা মাড়াই না আমরা। রাস্তাঘাট এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলে। মাঝে মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে আমরা রাস্তায় সেনাদের সাজোয়া যান দেখতে পাই। কখনও দেখি পুরো জিপ গাড়ি বোঝাই পাকিস্তান সেনা। রামগড় রোড ধরে চলে যায় উত্তর দিকে। কখনও উত্তর থেকে ফেরে দক্ষিণ দিকে। আস্তে আস্তে এসব গা-সওয়া হয়ে গেল আমাদের। আমরাও মাঝে মাঝে রাস্তাঘাটে বের হতে শুরু করি আবার। তবে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নয়।

বাবা হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকার মানুষ নন। আমাদের

নিয়ে মাঝে মাঝে তার পাঠচক্র চলে ঘরের মধ্যে। এসময় মেজদার কথা উঠলে বাবা কেমন গম্ভীর হয়ে যান। আমাদের ভীষণ মন খারাপ হয় তখন। জ্যাঠিমা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদেন আড়ালে। জ্যাঠা পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসে রেডিও শোনেন আর চুপচাপ চা খান। এভাবেই বয়ে যায় আমাদের জীবন।

বাবা একদিন বলেন, চল, আমরা একটু বাগানটার যত্ন নিই। কী ছিরি হয়েছে বাগানের!

উঠোনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গোয়ালঘরের পাশে আমাদের একচিলতে একটি বাগান আগে থেকেই ছিল। অনেক দিন বাগানে হাত লাগায় না কেউ। আকন্দ আর পাতাবাহারের গাছগুলো অযত্নে ঝোঁপালো হয়ে উঠেছিল। বাবা আমাদের নিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটেছেঁটে, খুপড়ি নিড়ানি দিয়ে মাটি নাড়িয়ে জল-সার ছিঁটিয়ে বাগানটাকে বেশ পরিপাটি করে তুললেন দুদিনে। তারপর আমাদের বৌদ্ধ বিহার থেকে নিজের হাতে নিয়ে এলেন লাল গোলাপের কলম করা একটি চারা। বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণার শুরুতেই লাগান চারাটি। আমাদের শিখিয়ে দেন কীভাবে এর যত্ন নিতে হবে। বাবার শেখানো নিয়মে আমরা বাগানের যত্ন নিতে থাকি নিয়মিত।

এর মধ্যে শোনা গেল একটি ঘোষণা। সরকার সরকারি কর্মচারীদের কাজে যোগদানের আদেশ জারি করেছে। অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরদিন সকালে জ্যাঠামণি বাবাকে বলেন, ভবেশ, সরকার তোদের অফিস তো খুলে দিলো। সব স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ঘরে বসে থেকে আর কী করবি? যা যা, অফিসে যোগ দে।

বাবার কী মনে হলো কে জানে! পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাকে বলেন, আমি শহরে যাব। বাসাটা একটু দেখে আসি। বাসায় জমির কিছু দলিলপত্র রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আসা দরকার। কখন আবার কী হয়!

মা বলেন, আর কদিন দেখে, বুঝেশুনে যেতেন না হয়।

–আজই যাই, কী হবে! পরিস্থিতি তো শান্তই আছে। বাবা সহজ ভঙ্গিতে বলেন। বলতে বলতেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

বাবা তৈরি হয়ে আমাদের কাছে ডাকেন। ছোটো ভাইবোন শক্তি আর সুচরিতাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে। মায়ের কোলে থাকা সাগরিকাকে চুমো খান আলতো করে। আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, শিমুল বাবা, ভালো থাকিস। মার কথা শুনিস। বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করিসনে। আমি ফিরে এসে তোদের যুদ্ধের ট্রেনিং দেব।

বলতে বলতে আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ান বাবা। বারান্দায় বসে জ্যাঠামণি রেডিওতে খবর শুনছিলেন। বাবাকে দেখে বলেন, ভবেশ, যাচ্ছিস? যা, সাবধানে যাস। সাবধানে থাকিস।

বাবা জ্যাঠামণির পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বাইরে পা বাড়ান। আমি ব্যাগ নিয়ে আগেই এগিয়ে এসেছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চৌরাস্তার মাথায় আসতেই বাবা বলেন, ব্যাগ আমাকে দে, তুই বাড়ি যা। আমি যেতে পারব।

আমার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকেন বাবা। আমার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। আমি তাকিয়ে আছি বাবার দিকে। বাবা পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। যেতে যেতে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন এক সময়, পাখি যেমন উড়তে উড়তে বিশাল আকাশের অথই নীলে মিশে যায়, ঠিক তেমনি করে।

আট

বাড়ি ফিরে আমার মনে পড়ে আজ দিনটি ২৭শে এপ্রিল। ঠিক এক মাস আগে ২৭শে মার্চ আমরা চট্টগ্রাম শহরের বাসা ছেড়ে বাবার হাত ধরে গ্রামে এসেছিলাম। এক মাস পর আজ আবার শহরমুখো হলেন বাবা।

বাবা যাওয়ার পর গ্রামটা বদলে যেতে লাগল দ্রুত। পাকিস্তানি সেনাদের তোড়জোড় বেড়ে গেল হঠাৎ। গ্রামে গ্রামে গঠন করা হলো শান্তি কমিটি। এ কমিটির কাজ হলো পাকিস্তানি সেনারা যাতে অবাধে চলাচল করতে পারে তা নিশ্চিত করা। আমাদের প্রতিবেশী দবির মিয়া হলেন এ কমিটির সদস্য। এখন দবির মিয়ার সঙ্গে পাঞ্জাবি সেনারা সারা দিন ঘুরে বেড়ায় গ্রামে। উপঢৌকন হিসেবে প্রায় সেনাদের দিতে হয় গ্রামের গৃহস্থ বাড়ির হাঁস-মুরগি-ছাগল। তাই বেশ ভয়ে আতঙ্কে কাটে গ্রামের মানুষের দিনকাল।

আমরা আগে থেকেই সতর্ক। চলছি রয়েসয়ে। এবার একেবারে দমে গেলাম। শোনা যাচ্ছে তরুণ ছেলেদের ওপরই পাঞ্জাবি সেনাদের নজর বেশি। তাই ঘরেই শুয়ে বসে লুডু, ক্যারাম খেলে সময় কাটাচ্ছি। আমরা ছেলেরা বাইরে যাই না বলে এখন মাঝেমধ্যে বাজারঘাটে যান বাড়ির সবচেয়ে বয়স্কজন, জ্যাঠামণি। বাকিটা সময় তিনি ঘরের মধ্যে বসে থাকেন চুপচাপ।

এর মধ্যে দুসপ্তাহ কেটে গেল। বাবা এখনও ফেরেননি। তার কোনো খোঁজখবরও পাই না আমরা। শহরের সঙ্গে এখন গ্রামের লোকজনের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। আমরা প্রতিদিন বাবার পথ চেয়ে থাকি। যতই দিন যায় ততই মার চোখ ঝাপসা হতে থাকে। হাঁটতে-বসতে মার এক প্রশ্ন, বাবা এখনও ফিরে আসছেন না কেন?

আরও এক সপ্তাহ কাটল। আজ বাজারে গিয়েছিলেন জ্যাঠামণি। সন্ধ্যার আগে আগে বাজার থেকে ফিরেছেন। ঘরে ঢুকে ভেতরের বারান্দায় মাকে দেখতে পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান হঠাৎ। ফুরফুরে মনে বলেন, শোনো প্রীতি, আজ বাজারে পাশের গ্রাম হাইদচকিয়ার মহাজন বাড়ির নৃপেন বাবুর সঙ্গে দেখা। গতকাল তিনি শহর থেকে এসেছেন। তিনি বললেন, শহরে ভবেশের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তা অবশ্য আঠারো-বিশ দিন আগে। নিশ্চয় ও শহরে ভালো আছে।

মা উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, তাহলে একবার বাড়ি আসছেন না কেন? এতদিন তো শহরে থেকে যাওয়ার কথা না।

–আসবে, আসবে। হয়ত ব্যস্ত আছে। তুমি চিন্তা করো না। বলতে বলতে জ্যাঠামণি নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ান।

আরও এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। আজ ২৭শে মে। বাবার শহরে যাওয়ার মাস পূর্তি হলো আজ। মার আর তর সয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তিনি নতমুখে জ্যাঠামণির সামনে দাঁড়ান। জ্যাঠামণি রেডিওতে বিবিসির খবর শুনছিলেন। রেডিও বন্ধ করে মার দিকে তাকান।

–কিছু বলবে প্রীতি?

মা নম্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, এক মাস তো পেরিয়ে গেল, শিমুলের বাবা ফিরে এলেন না। আমি শহরে যেতে চাই।

–তুমি, শহরে যাবে! কেন?

জ্যাঠামণির গলায় বিস্ময়।

–উনার খোঁজখবর নেওয়া দরকার। আমি শিমুলকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

–শিমুলকে সঙ্গে নেবে! ও একটা তরুণ ছেলে।

মার প্রস্তাব যেন কিছুতেই মানতে পারছেন না জ্যাঠামণি।

–আমি নিরুপায়। বলেই জ্যাঠামণির সামনে থেকে সরে এলেন মা। আমাদের ঘরে ঢুকে বলেন, শিমুল, বাবা, ঝটপট তৈরি হয়ে নে। আমার সঙ্গে তোর শহরে যেতে হবে। তোর বাবার খোঁজ নিতে হবে।

নয়

আমরা যখন শহরে পৌঁছি, তখন বেলা দুপুর। পথের কথা ভেবে আমরা যত ভয় পেয়েছিলাম, সেরকম কিছু ঘটেনি। প্রথমে জিপ গাড়িতে করে নাজিরহাট, তারপর বাসে চড়ে এসেছি শহরে। শহরের বাসায় এসে দেখি, বাইরে তালা লাগানো। আশপাশের সব বাসায়ও তালা ঝুলছে। মার কাছে রাখা চাবি দিয়ে তালা খুলে আমরা বুঝতে পারি, ঘর খোলা হয় না অনেকদিন। ঘরে একটা গুমোট গন্ধ। তার মানে বাবা বাসায় থাকেন না। তাহলে বাবা কোথায়?

মা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, সঠিক খবর আমরা পেতে পারি একমাত্র জমির মিয়ার কাছে।

জমির মিয়া বাবার অফিসের দারোয়ান। তার বাসা আমি চিনি। তিনি আবার আমাদের পাড়ার জামাল চাচার গ্রাম সম্পর্কের ভাই। জামাল চাচা মানে সেই জামাল চাচা, যিনি বাবার সহকর্মী ও প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী, যিনি ২৬শে মার্চ রাতে বিহারিদের অস্ত্রের দোকান লুটে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জামাল চাচা এখন কোথায় আছেন কে জানে। তার চেয়েও বাবার খবরের জন্য আমাদের দরকার জমির মিয়াকে। বিকেলে নিশ্চয় তাকে বাসায় পাওয়া যাবে।

আমি আর মা বিকেলে জমির মিয়ার বাসায় গিয়ে হাজির। আমাদের তিনি চিনতে পারলেন। তার খাটের ওপর বসতে দিলেন আমাদের। তারপর কোনো রাগঢাক না করেই কথা শুরু করেন তিনি। বলেন, ভবেশবাবু ৩০শে এপ্রিল অফিসে গিয়েছিলেন। গেইটে তার সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাকে একটু আড়ালে ডেকে জানতে চাই, কেন এসেছেন? ভবেশবাবু আমাকে বলেন, সরকার চাকরিতে যোগ দিতে বলেছে না? আমি তাকে বলি, ওসব ভুয়া কথা। আপনি চলে যান, আপনাকে পেলে ওরা ছাড়বে না। ওরা জামাল ভাইকেও ধরেছে। জামাল ভাইকে ধরেছে শুনে বাবু চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তখনই তার বিভাগের বস বিহারি হজমতউল্লাহ অফিসের গেইটে গাড়ি থেকে নামলেন এবং তিনি বাবুকে দেখতে পান। বাবুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে একথা-সেকথা বলতে বলতে বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান উপরে। কিছুক্ষণ পর আবার নেমে আসেন নিচে। বাবুকে সঙ্গে করে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যান হজমতউল্লাহ। এরপর আর তাকে দেখিনি বলতে বলতে চোখ ছলছল করে ওঠে জমির মিয়ার। একটু থেমে আবার বলেন, বড়ো ভালো লোক ছিলেন বাবু। আমাকে টাকাপয়সা দিয়ে কত সাহায্য করতেন!

আমি বসা থেকে উঠে মার পাশে দাঁড়িয়েছি মাত্র, এমন সময় দেখি মা আমার বুকের ওপর ঢলে পড়ছেন। আমি বুঝলাম, মা জ্ঞান হারিয়েছেন। হঠাৎ কী করব বুঝে উঠতে না পেরে আমি দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরি, 'মা মা' করে ডাকতে থাকি।

জমির মিয়া দৌড়ে গিয়ে পানির জগ এনে মার চোখে মুখে পানির ছিটা দিতে থাকেন। আর আপন মনে বলতে থাকেন, এমন ভালো মানুষকে আল্লাহ নিশ্চয় রক্ষা করবেন। আপনারা এভাবে ভেঙে পড়বেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার বিশ্বাস, ভবেশবাবু ফিরে আসবে।

কিছুক্ষণ পর মা চোখ খুললেন। কিন্তু কথা বলতে পারলেন না।

দশ

পরদিন সকালেই আমরা আবার ফিরে এলাম গ্রামে। মা পাথরের মতো নির্বাক। মুখে কোনো কথা নেই।

এতদিন মেজদার জন্য কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন জ্যাঠিমা। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছেন মা। সারা বাড়িতে নেমে এসেছে অদ্ভুত এক নীরবতা। হাসি নেই, আনন্দ নেই। সুখ-দুঃখের কথা নেই। সবাই গুটিয়ে আছে নিজের মধ্যে নিজে। কারোই যেন প্রাণ নেই। এত বড়ো পরিবার আমাদের, অথচ মাঝে মাঝে মনে হয় বাড়িটা এক মৃত্যুপুরী।

কিন্তু বাইরের জীবন থেমে নেই। বয়ে চলেছে একই ধারায়। যুদ্ধ জয়ের জন্য পাকিস্তান বাহিনীর ফন্দিফিকিরের কমতি নেই। শান্তিবাহিনীর পর গঠিত হয়েছে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী। আমাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছে এসব বাহিনীতে। তাদের ঠাঁট, জাঁক দেখার মতো। গায়ে খাকি পোশাক, পায়ে সু, মাথায় টুপি, কাঁধে চায়নিজ রাইফেল। হেলেদুলে হাঁটে যেন তালপাতার সেপাই। দিনেরবেলা গ্রামে চলে তাদের দৌরাত্ম্য। রাতেরবেলা রাস্তা কাঁপিয়ে যায় বড়ো বড়ো জিপ, লরি, ট্যাঙ্ক। কেবল ঝনঝন ঝরঝর শব্দ। কীই-বা তারা নেয়, কোথায় নেয় আমরা জানি না। কখনও আবার একটানা গুরুম গুরুম, ফট ফট, টা টা টা শব্দ। মাঝে মাঝে মনে হয় আকাশ-পাতাল সব এক হয়ে যাচ্ছে। যেন গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে চরাচর। কখনো দেখা যায় কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া, কখনও রাতের নিকষ আঁধার ছাপিয়ে ওঠে আগুনের শিখা। শোনা যায় না শুধু মানুষের কান্নার শব্দ। মানুষ যেন পাথর।

এভাবেই চলছে দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস। এক মাস, দুমাস তিন মাস। তারপর চারদিকে হঠাৎ উদ্দাম উল্লাস। আমরা শুনি বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আমরা আনন্দে আত্মহারা। তাহলে কি বাবা ফিরে আসবে? মেজদা ফিরে আসবে? আমরা আশায় বুক বাধি। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, চারদিকে মানুষ থইথই। চেনা-অচেনা কত মানুষ ফিরে আসছে রাস্তা ধরে, গাড়ি চড়ে। কেউ হাসছে, কেউ স্বজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। অপূর্ব এ মিলন মুহূর্ত।

হঠাৎ আমাদের বাড়িতেও এমন হইচই। সকালে ঘুমের মধ্যেই আমরা শুনছি মেজদা ফিরে এসেছে। সারা বাড়িতে হুড়োহুড়ি, ধুপধাপ শব্দ। ভেতরের বারান্দায় এসে দেখি, একটা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে জ্যাঠিমা। দাঁড়ি-গোঁফে ছেলেটার মুখ ঢাকা, মাথায় লম্বা চুল। পরনে মোটা কাপড়ের একটি ফুলশার্ট ও ফুলপ্যান্ট। চেনা যায় না। সবাই বলছে এটাই মেজদা। আমরা অবাক হয়ে দেখছি। মা ছাড়া সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এখানে।

মাকে দেখি আমাদের ঘরের বিছানার ওপর বসে কাঁদছেন। মার কান্না আমার সহ্য হয় না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে ঝলমলে সকাল। চারদিক যেন হাসছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখি আমাদের বাগানটাও হেসে উঠেছে। আমি পায়ে পায়ে বাগানের কাছে এসে দাঁড়াই। এ কী! বাবার লাগানো গাছে আজ প্রথম ফুল ফুটেছে–লাল গোলাপ। আমার দিকে যেন তাকিয়ে আছে গোলাপটা। বাতাসে তিরতির করে দুলছে। বাবা যেন কথা বলছেন আমার সঙ্গে। মনে হলো, বাবাই লাল গোলাপ, বাবাই বিজয় ফুল।

দেখেছে মহাকাল

শেখ সালাহ্উদ্দীন

দৃশ্যমান যতটা তারচে' বেশি দেখেছিলে তুমি
অন্যায্য শাসনে মৃতবৎ একটি বদ্বীপ ভূমি;
জল-সবুজের ক্যানভাসে দৃপ্ত আলপনা এঁকে
হেঁটেছ ফসলভারে নত মাঠময়– অসীম আকাশ দেখে
প্রসন্ন প্রকৃতি, বহতা নদীর কাছে সারাক্ষণ
পাঠ নিয়েছে তোমার শিশু-মন।
এভাবেই সাগরে রূপান্তরিত বক্ষে
একটা সম্পূর্ণ দেশ নিল আসন অলক্ষে–

সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঘুমন্ত মন
জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় কখন
জেগে উঠল জানতে পারেনি তা কেউ
সেই প্রমত্ত সমুদ্র ঢেউ
ভাসিয়েছে নিমেষে সকল কণ্টক, জঞ্জাল
বিস্ময়ে দেখেছে মহাকাল–

স্বাধীনতার গান

সোহরাব পাশা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
চেতনার বাতিঘর তিনি দীপ্ত সূর্যের সমান

নীল আকাশে লাল-সবুজের ওই পতাকা
বঙ্গবন্ধুর প্রাণের গহিন স্বপ্ন আঁকা

এ মাটির যেখানেই ছোঁবে মুজিব উঠবে হেসে
অকাতরে দিয়েছেন প্রাণ এদেশকে ভালোবেসে

মুজিব মানে আঁধার ভেঙে জেগে ওঠা দৃপ্ত প্রাণ
মুজিব মানে বাংলাদেশ, স্বাধীনতার জয়গান

মুজিব মানে বাঙালির মুখ বাঙালির সুখ
মুজিব মানে বাঁধনছেঁড়া ইস্পাত কঠিন বুক

মুজিব তুমি বাঙালির তুমি তো বাংলার
মৃত্যু নেই তোমার, ফিরে আসবে তুমি বার বার

হে মুজিব, মৃত্যু তোমাকে করেনি নিঃশেষ
তুমি আছো প্রাণে প্রাণে যতদিন আছে বাংলাদেশ।

কবিতা আমার কাছে

লিলি হক

কবিতা আমার কাছে প্রচণ্ড গরমে শীতল বাতাস
আমার প্রিয় পুরুষ যেমন
আমার কাছে সুবিশাল উদার আকাশ,
আমার চারপাশ যেমন বৃক্ষরাজি শোভিত উদ্যান
মায়ের স্তনবৃন্তে মুখ রেখে নিশ্চিতে শিশুর
বেড়ে ওঠা অস্থিমজ্জা প্রাণ।

জন্ম থেকে শৈশব-কৈশোর-যৌবন যেন কবিতা
আমার কাছে লতাপাতায় জড়িয়ে থাকা
বটপাকুড়ের চারা দিনে দিনে বিরাট মহিরুহ।
কবিতা আমার কাছে প্রমত্ত ঢেউয়ের ফেনা
রাশি রাশি, জীবন চলার চড়াই-উতরাই পথে উল্লাস
গান-কথা-হাসি ছন্দময় দিন রাত্রির পালাবদল,
আমার হৃৎপিণ্ড শ্বাসনালী ছুঁয়ে যাওয়া অধর কোমল।

কবিতা আমার কাছে স্বচ্ছ জলের প্রতিবিম্ব,
সমস্ত বাধা মৃত্যুভয় তুচ্ছ ভেবে
অসম্ভবকে সম্ভব করা!
কবিতা আমার কাছে অসত্য অন্যায়ের
বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া অ্যাটম বোমা,
বন্ধুর জন্য নিঃশর্ত ভালোবাসার দ্রাঘিমা।

কবিতা আমার কাছে বলিভিয়ার জঙ্গলে চেগুয়েভারা আর
নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তিকামী প্রতিকৃতি,
যার আদর্শে শান্তির জন্য দিতে পারি
সমস্ত যৌবনকে কারাগারে আত্মাহুতি।
সেই কবে জন্মকাল থেকে জ্বলছি জ্বলছি
প্রজ্বলিত শিখার মতো কবিতার মশালে,
আমার হৃদয়ে কবিতার স্ফুলিঙ্গ
প্রতি মুহূর্তে জ্বলে জ্বলে এবং জ্বলে।

মহান নেতার পুরস্কার

প্রণব মজুমদার

কোটি মানুষের হৃদয় জাগ্রত মুক্তির আশায়,
ডাক দিলেন দেশপ্রেমিক নেতা ভালোবাসায়।
সংগ্রামে ত্যাগে সোচ্চারে দেশ, চাই স্বাধীনতা;
যুদ্ধে শত্রুর মোকাবিলা রণ সংগীত, কত কথা!

নিজের জীবনও মৃত্যুমুখে সেদিন ছিল বহমান
একজনই আছেন তিনি শেখ মুজিবুর রহমান।
রেসকোর্স মাঠে সেদিন লাখো জনতার মাঝে,
তাঁর উদাত্ত আহ্বানে মানুষ মাঠ ছাড়ে সাঁঝে।

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এখনও বাজে;
এ যেন মহাকাব্য, উদীপ্ত শক্তি যাপন কাজে!
স্বাধীনতা হেলাফেলা নয়, বাংলার অলংকার;
স্বেচ্ছাচারিতা নয়, তা মহান নেতার পুরস্কার!

সবুজ সুন্দর দেশ, স্বাধীনতার স্বপ্ন আঁকা মনে
বাঙালির শ্রম ও ত্যাগ অটুট থাকুক প্রাণপণে।

উনিশশো একাত্তরের মার্চে

মোহাম্মদ আজহারুল হক

উনিশশো একাত্তরের মার্চে
পল্টনের মাঠে পতাকা উড়ায়
উনিশশো একাত্তরের মার্চে
রেসকোর্সের ভাষণ দেশমাতায়।

উনিশশো একাত্তরের মার্চে
জাতি ছিল মুক্তির উন্মাদনায়
উনিশশো একাত্তরের মার্চে
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণায়।

উনিশশো একাত্তরের মার্চে
সবাই ছিল প্রতিরোধ গড়ায়
উনিশশো একাত্তরের মার্চে
বাঙালি ছিল মুক্তির লড়ায়।

উনিশশো একাত্তরের মার্চে
মুজিব পাকিস্তানের ভিত কাঁপায়
উনিশশো একাত্তরের মার্চে
মুজিবের ডাকে জাতি যুদ্ধে ঝাঁপায়।

স্বাধীনতা আমার কাছে

আ. শ. ম. বাবর আলী

স্বাধীনতা আমার কাছে
রোদেলা আকাশ,
যেখানে অসংখ্য পাখিরা
দলবেঁধে খেলা করে
মুক্ত ডানা মেলে
সারাদিন ধরে।

স্বাধীনতা আমার কাছে
সবুজ অরণ্য,
যেখানে সুন্দর ফুলেরা সুগন্ধ ছড়ায়
সারা বনজুড়ে।
সে ফুলের ওপর আনন্দে নৃত্য করে
প্রজাপতি মৌমাছি ভোমরার দল

স্বাধীনতা আমার কাছে
সবুজ গাঁয়ে বয়ে যাওয়া নদী,
যেখানে উদাস কণ্ঠে
ভাটিয়ালি গেয়ে
নাইওরি-নাও বেয়ে যায় মাঝি
গাঁয়ের বধূকে সাওয়ারি করে।

স্বাধীনতা আমার কাছে
এমনি অনেক কিছু,
অনেক সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে
আনন্দ বসতি গড়তে।

স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা

মিয়াজান কবীর

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
সখিনার তাজকেল্লাপুরে
পিতা-কন্যার রণক্ষেত্রে।
দেখেছি তোমাকে
ঈশা খাঁর নাঙ্গা তরবারি হাতে
একডালা দুর্গে।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
চাঁদপ্রতাপ পরগনার-ডাকছড়ায়
বিনোদরায়ের দুর্জয় ঘাঁটিতে।
দেখেছি তোমাকে
ভাগীরথীর তীরে সিরাজ-উদ-দৌলার
দেশপ্রেমের এক অপূর্ব মহিমায়।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
হাজী শরীয়তউল্লাহর চারিগ্রামে
উন্মাতাল ফরায়েজী আন্দোলনে,
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লায়।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
সিপাহি বিদ্রোহের দাবানলে,
লালবাগ আর বাহাদুরশাহ পার্কে
আন্টা ঘরে ঝুলন্ত লাশের মিছিলে,
সাঁওতাল, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অগ্নিদীপ্ততায়।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
জালালাবাদ পাহাড়ের চূড়ায়
মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতার
অকুতোভয় যুদ্ধের হুংকারে।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
বাহান্নর আগুনঝরা ফাগুনে
রফিক, বরকত, জব্বার
শফিউর, সালামের আত্মত্যাগের বন্দনায়
রক্তজবা, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশের সমাহারে।
স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
উনসত্তরের আসাদ, মতিউরের
দেশপ্রেমে আত্মবলিদানের উপমায়।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
একাত্তরে নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হয়ে ওঠা,
একহাতে গ্রেনেড আরেক হাতে রাইফেল নিয়ে
অগ্নিসেনাদের প্রতিরোধ যুদ্ধে
আলমাস, আওলাদ, হাশেম, হাকিম, আক্কেল আলীর
আত্মোৎসর্গিত রক্ত-আখরে।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমাকে
পুত্রহারা পিতার কান্না
মায়ের আহাজারি
স্বামীহারা বিধবার বিলাপ
ভাইহারা বোনের আর্তনাদ
পিতাহারা সন্তানের অশ্রুঝরা বেদনায়।

স্বাধীনতা দেখেছি তোমায়
'বীরের এ রক্তস্রোত, মায়ের এ অশ্রুধারায়'
জেগে ওঠা পলিমাটির বুকে
লালখচিত সূর্যের রক্তিম আভায়
সবুজ পতাকায়, বিজয় উল্লাসে
স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা।

মুজিব আমার স্বাধীনতা

দেলওয়ার বিন রশিদ

মুজিব আমার জাতির পিতা
মুজিব স্বপ্ন আশা
মুজিব আমার সুখ সুরভি
মুজিব ভালোবাসা।

মুজিব আমার জয় পতাকা
মুজিব আমার স্বাধীনতা
মুজিব আমার শক্তি সাহস
চলার পথে নির্ভরতা।

মুজিব আমার মুক্ত আকাশ
দীপ্ত আলোর রবি
মুজিব আমার পথের দিশা
হাজার যুগের কবি।

মুজিব আমার প্রাণের প্রদীপ
শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বীর
মুজিব আমার গর্বগাথা
নিত্য উচ্চশির।

স্বপ্নের সোনার বাংলা

অজিতা মিত্র

হৃদয় থেকে উৎসারিত সুরে
'সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি',
তোমার মাটির তিলক ধারণ করে
মাটির মানুষ মাটির কাছে আসি।

এই মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন পিতা,
ঘুমিয়ে আছেন লক্ষ মুক্তিসেনা;
এই মাটিকেই স্বর্গ সমান জানি,
এই মাটি যে রক্ত দিয়ে কেনা।

যুদ্ধ করে পাওয়া স্বাধীনতা
যুদ্ধ করেই রক্ষা করে যাব!
জাতির পিতা স্বপ্ন দেখেছিলেন–
এই মাটিতেই সোনার বাংলা পাব।

পিতার ভাষণ নয় তো শুধুই কথা,
স্বপ্ন দেখায়, সাহস জোগায় প্রাণে;
সকল কাজে তাঁকেই স্মরণ করে
আমরা আছি দেশের সকলখানে।

কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমার,
শ্রমিক যেন বাঁচতে পারে সুখে,
পুরুষ-নারী সমান সুযোগ পাবে,
ফুটবে হাসি সকল শিশুর মুখে!

আত্মত্যাগের মহান ব্রত নিয়ে
এগিয়ে যাব দেশের সকল কাজে,
জাতির পিতার স্বপ্ন ছুঁয়ে যাব,
কথার প্রমাণ দেব কাজের মাঝে।

স্বদেশের জন্য প্রার্থনা

খান চমন-ই-এলাহি

প্রিয় স্বদেশ আমার
মা-মাটি-মাতৃভাষায় দুচোখে আঁকা
প্রাণের বাংলাদেশ।

পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-মধুমতী-কর্ণফুলি তীর
সবুজ শস্যের মাঠ
পাহাড়ি ঝরনার গান
সমতলের হাসি-নদীর কলতান
পাখি ডাকা ভোর
আদিগন্ত তোমাকে জানায় সম্ভাষণ।

এখানে আকাশ এখানে মৃত্তিকা
এই জল এই অগ্নি
উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম বিভেদ ভুলে
ঐক্যের আহ্বানে স্যালুট জানায়।

তুমিহীন আমি কেউ নই
কিছুই আমার নয়
এই আমি, সবিনয় তোমার প্রণয়কাতর
জানে অন্তর জানে অন্তর্যামী।

নিকষ অন্ধকারে সূর্যের রঙে
কর্মে কিংবা বিশ্রামে
তোমার কল্যাণে প্রার্থনা নত হই।

আমাকে আগলে রাখো
হে আমার জননী-পিতৃপুরুষের দেশ
আমার বাংলাদেশ।

জাতির পিতাকে অর্ঘ্য

দেবকী মল্লিক

সমাজ বিবর্তনের কোনো এক জটিল ঘূর্ণাবর্তে পড়ে
যেদিন বিকৃত হচ্ছিল–
সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, মানবতা,
নিষ্পেষিত হচ্ছিল লক্ষ লক্ষ জনতা
ন্যায্য হিস্যা থেকে পাচ্ছিল বঞ্চনা।
দেবদূতের মতো আবির্ভূত হয়ে
মুক্তির গান শুনিয়ে, অমৃত ধারা বইয়ে
একতারে বেঁধে, এনে দিলে শান্তির বারতা।
চেতনায় এল শিহরণ,
নত শির হলো উন্নত।
সে কেবল ধাইল আকাশপানে
সহস্র যোজন দূরে যার সীমানা–
অসীমের মাঝে সসীমকে খুঁজে পেল,
ন্যায্য হিস্যা বুঝে নিলো রক্তের বিনিময়ে
যারা রক্তের হোলি খেলে
নিষ্পাপ জীবনের করেছিল অবসান–
হে পিতা!
তোমার স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে–
জেগে উঠেছিল প্রাণ।
তুমি লহ সশ্রদ্ধ সেলাম।

অগ্নিঝরা মার্চ

এম হাবীবুল্লাহ

অগ্নিঝরা মার্চে এসে
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শেষে
হলো সবাই জড়ো।
পঁচিশ তারিখ কালরাতে
পাক সেনারা ধ্বংসে মাতে
ঐক্য সবে গড়ো।

পাক সেনাদের ছিল না হুঁশ
প্রাণ হারালো ঘুমের মানুষ
আঁতকে উঠে সবে
ছবির মতো এ দেশখানি
দেখে অস্ত্রের ঝনঝনানি
স্বাধীন হবে কবে?

কৃষক-শ্রমিক-আমজনতা
ঘোষণা দেয় একাত্মতা
করতে হবে যুদ্ধ
মা-বোনেরা সারি বেঁধে
বাইরে এল কেঁদে কেঁদে
হয়রে জোটবদ্ধ।

মিলেমিশে সব একাকার
করল শুরু শত্রু সাবাড়
জিততে হবে শেষে
মুক্তিসেনা আসলো তেড়ে
পাক সেনাদল গেল হেরে
সোনার বাংলাদেশে।

তুমি ইতিহাসের নায়ক

আবীর আহাম্মদ উল্যাহ

তুমি বাংলার 'জাতির পিতা'
তুমি বিশ্ব নেতা
বিশ্ব সভায় আজ যে তোমার
সাতই মার্চের কবিতা।

তুমি মানে তো ইতিহাস
তুমি যে বাংলাদেশ
তোমার আদর্শকে যায় না
কখনো করা শেষ।

মুক্তিযোদ্ধা গায় তব গান
তুমি দেশের সম্মান
তুমি হাজার বছরের
বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান।

আজও হতো না দেশ স্বাধীন
থাকতে হতো পরাধীন
আমরা এই স্বাধীনতার স্বাদ
পেতাম না কোনো দিন।

তুমি ইতিহাসের নায়ক
আমরা শুধু পাঠক
তুমি হটিয়েছ বর্বর
পাকিস্তানি শাসক।

বঙ্গবন্ধু আমার অস্তিত্ব আমাদের অহংকার

আতিক আজিজ

বঙ্গবন্ধু, তোমার সবুজ শ্যামলিমা আমার প্রাণের লাবণ্য
প্রতিদিনের অহংকার
তোমার অবারিত সুন্দর আমার অনুভব চেতনার।
তোমার বুকজুড়ে হাজার নদীর কলতান
গাছে গাছে পাখির কাকলি, বাতাসে ফুলের সৌরভ
আর মাঝিমাল্লার দরাজ কণ্ঠের ভাটিয়ালি
আমার সত্তাজুড়ে প্রতিদিন ফোটে ওঠে
স্বপ্নের রঙিন দীপাবলি।

তুমি আমার আত্মার আনন্দ জয়গান
তুমি আমার প্রাণ থেকে উৎসাহিত ভালোবাসার সঞ্জীবনী উপাখ্যান।
তোমার এই রূপের পসরা কেড়ে নিতে চায় কোন হায়েনা
তোমার আঁচল যখন কেউ করতে চায় ভূলুণ্ঠিত
তোমার অস্তিত্ব যখন হয়ে ওঠে শ্বাপদসংকুল ঘেরা সংকটাপন্ন
তখন আমরা, তোমার এই দামাল সন্তানেরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ি
ঘৃণায় ক্ষোভ, ব্যথায় বারুদে আমরা জ্বলে উঠি এক সাথে
কপালে গামছা কোমড়ে কার্তুজ হাতে রাইফেল নিয়ে ছুটে যাই
রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে
শত্রু হননের অদম্য জিঘাংসায়।

বঙ্গবন্ধু, তোমার সম্মান আমাদের জীবনের চেয়েও মূল্যবান
তোমার সাথে আমাদের আজন্ম ভালোবাসা
বিনে সুতোর মালার মতো একাকার
তাই জীবনে-মরণে প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে
তুমি আমার আমি তোমার এ যেন আমাদের
পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো পাওয়ার অহংকার।

আজ সাতই মার্চ

ইমরুল ইউসুফ

সেদিন আলো ফোটা ভোরে– শিশির বলল, আজ আমি জলীয়বাষ্প হবো না
পাতা বলল, আজ আমার কোনো প্রয়োজন নেই সালোকসংশ্লেষণের
ফুল বলল, আজ আমার প্রগাঢ় রং, স্নিগ্ধ গন্ধ ছড়াবো না বাতাসে
পাখি বলল, আজ আমি উড়ে যাব না কোথাও, কোথাও না–
ঘাস বলল, আজ আমি সবুজের মতো সুন্দর সেই মানুষটির পায়ের স্পর্শ পাব
ভেবে বার বার শিউরে উঠছে শরীর
আকাশ বলল, আজ আমি মেঘ হবো না, ছুটবো না পঙ্খিরাজের মতো দিগবিদিক
বাতাস বলল, আজ আমার অখণ্ড অবসর, বয়ে যাব না কোনোখানে
পোকামাকড় কীটপতঙ্গ বলল, আজ জেগে থাকার দিন, মাটির নিচ থেকে উপরে আসার দিন
মাটি বলল, এই যে আমি খাঁটি বাংলার– মাটির ওই মানুষটির জন্য অপেক্ষায়
ইট, কাঠ, পাথর বলল, আমরা আজ পাহাড়ের মতো অটল
সেই মানুষটির কথা শোনার অপেক্ষায়;
সাগর, নদী, পাহাড় বলল, আমরাও যাব স্বপ্নের মতো সুন্দর সেই মানুষটিকে দেখতে–

মঞ্চ ঘিরে দাঁড়ালো ভোরের শিশির, পাতা, ফুল, পাখি, ঘাস, আকাশ, বাতাস, কীটপতঙ্গ
স্বাধীনতার লড়াইয়ে অকুতোভয় লক্ষ লক্ষ সৈনিক
আজ এখানে– এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কারণ আজ সাতই মার্চ।

মহান নেতা শেখ মুজিবুর

মো. ইউনুছ আলী

তুমি ছিলে বাঙালিদের স্বপ্ন এবং আশা
তোমার প্রতি ছিল সবার অগাধ ভালোবাসা।
সবার প্রতি দরদ ছিল, ছিল নিখুঁত মায়া
বাংলাদেশে দেখি তোমার হাতের ছায়া!

একটি ভাষণ দিলে তুমি, উঠল সবাই তেতে
নির্ভয়ে তাই লড়ল মানুষ স্বাধীনতা পেতে।
দেশটা তুমি করলে স্বাধীন, হওনি ক্ষান্ত মোটে
তোমার ছবি আঁকা আছে সবার হৃদয়পটে।

দেশের প্রতি ভালোবাসার মডেল তুমি আজও
ভালোবাসার মানুষগুলো ধরে তোমার সাজও।
তোমার কণ্ঠ নকল করে আজও চলে ভাষণ
বাঙালিদের হৃদয় মাঝে তোমার শক্ত আসন!

দেশের মানুষ করছে স্মরণ দোয়া-দরুদ পড়ে
প্রার্থনার ঐ শব্দে দেখি গাছের পাতা নড়ে!
কবর দেশে ভালো থাকুন, থাকুন শান্তি-সুখে
অনন্তকাল বেঁচে থাকুন বাঙালিদের বুকে!

আমি সেই বজ্রকণ্ঠের কথা বলি

জয়জিৎ দত্ত

আমি সেই বজ্রকণ্ঠের কথা বলি
যাঁর ধ্বনিতে কেঁপে উঠেছিল সমগ্র বাংলাদেশ
যে হেনেছিল সবার মাঝে সৃজনশীলতার বান;
আমি সেই রুদ্রপ্রতাপ মানুষটির কথা বলি
যাঁর ডাকেতে গণজোয়ারে ভেসেছিল সারা দেশ
যে দিয়েছিল সবার মাঝে নতুন প্রাণ।

আমি সেই কিংবদন্তির কথা বলি
যাঁর কথা ভুলেনি আজও বাংলার তরুলতা,
যাঁর হাত ধরে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা।
যে শিখিয়েছে লড়তে সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে,
যাঁর এক ডাকে দলে দলে লোক গিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে;
ধরেছে অস্ত্র, করেছে যুদ্ধ, এনেছে মহান বিজয়,
সেই বিজয় ধ্বনিতে আজও যাঁর নাম অক্ষত রয়।

বাংলার সব নদনদী যাঁর কথা কয়ে কয়ে বয়,
মুক্তিকামী পথদ্রষ্টা, ছিল যে চির জ্যোতির্ময়।
সেই কণ্ঠ বাঙালির কাছে আজ নয়ত অজানা,
যাঁর বাণী আজও সবার হৃদয়েতে দেয় হানা;
ঘাতক-দালালের হাতে নির্মমভাবে যে দিয়েছে আপন প্রাণ
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সে যে শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৭১ সাল

শামসুল আলম টুকু

আমি দেখেছি ১৯৭১ সাল
বাংলার পথে-ঘাটে জনতার মিছিল
আর জ্বলন্ত মশাল।
আমি দেখেছি একদিকে
স্বাধীনতাকামী মানুষের হাহাকার আর চিৎকার
অন্যদিকে পাক বাহিনীর বর্বরতা আর অত্যাচার।
আমি দেখেছি স্বামীহারা বিধবার কাঁদন
সন্তানহারা পিতার আর্তনাদ
আর পথিকের ভয়ে ভয়ে পথ চলা তবুও মরণ।
আমি দেখেছি পাক বাহিনীর কামান, রাইফেল আর বন্দুক
আমি দেখেছি জঙ্গিবিমানের হুংকার
আর প্রেমিকের সদ্য গুলি করা বুক।
আমি আরও দেখেছি
শত শত গ্রামবাসীর পাক বাহিনীর লেলিয়ে দেয়া
আগুনের সাথে যুদ্ধ করতে।
আর কঙ্কাল ছেলেটাকে বুকে নিয়ে
কৃষানির গ্রামের পথ ধরে পালিয়ে যেতে।
আমি আরও দেখেছি
ক্ষুধার্ত জনতার কান্নার মিছিল
আর পাক সেনাদের অট্টহাসি।
আমি আরো দেখেছি
সারা দিন পরে
একমুঠো খেয়ে নিয়েছে স্বাধীন হবার শপথ
আমি আরো দেখেছি
ক্ষুধার জ্বালায় বুভুক্ষু জনতার
খেতে গাছের ছাল-পাতা
এমনি করেই এনেছি আমরা
এই রক্তরাঙা স্বাধীনতা।

লাল-সবুজের পতাকা

সাবিত্রী রানী

লাখো বাঙালি শহিদ হলো স্বাধীনতার জন্য
বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় তাঁরাই হলো ধন্য।
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অস্ত্র ধরল
নয় মাস যুদ্ধ করে শত্রুকে জয় করল।
বীর মুক্তিযোদ্ধার অসীম বিক্রমে শত্রু ভয় পায়
পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করে হয়ে নিরুপায়।
অবশেষে পেলাম মোরা লাল-সবুজের পতাকা
বীর বাঙালির বীরত্বগাথা যেথায় আছে আঁকা।
একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর বাংলার বিজয়
বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ পেল স্বতন্ত্র পরিচয়।

বেতার একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে বেতার একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সব ধরনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু মিডিয়া বৈচিত্র্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। স্বাধীন গণমাধ্যম দেশ ও জাতির কল্যাণ ও মুক্তির আলোকবর্তিকা। এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য– 'সবাই মিলে বেতার শুনি, বেতারেই আস্থা রাখি' (Radio and Trust) অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট ১লা মার্চ ২০২২ বঙ্গভবনে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ পেশ করেন– পিআইডি

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ বেতার দেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যম। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গর্বিত উত্তরসূরি বাংলাদেশ বেতার আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনমানুষের তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের অন্যতম উৎস। এছাড়াও যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন বার্তা প্রচারেও বাংলাদেশ বেতারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করতে বাংলাদেশ বেতার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে– এ প্রত্যাশা করি।

গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, একটি জ্ঞানমনস্ক, সুন্দর ও আলোকিত সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। মানব সভ্যতার সূচনা ও বিকাশ এবং ধারাবাহিকতার অমূল্য তথ্যাবলি পুস্তকে গ্রন্থিত থাকে। গ্রন্থাগার সেই সংখ্যাতীত পুস্তকের বিপুল সমাহারকে ধারণ করে। মানবের উপলব্ধিগত জীবনবোধ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও উত্তর প্রাপ্তির সবকিছু স্পষ্ট হয়ে ওঠে গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে। বই পড়ার এই অবারিত সুযোগ করে দেয় গ্রন্থাগার। ৫ই ফেব্রুয়ারি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্যপ্রযুক্তির চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থাগারের প্রচলিত ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, গ্রন্থাগার এখন পায়ে চলা পথ পেরিয়ে প্রযুক্তির মহাসড়কে পদার্পণ করেছে। পরিবর্তনের এই নতুন ধারার সাথে তাল মিলিয়ে সরকার গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করছে, পাশাপাশি গ্রন্থাগারগুলোকে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ঘরে বসেই অনলাইনে তথ্য আহরণের সুযোগ সৃষ্টি করছে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর দেশের লাইব্রেরিসমূহে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন' প্রকল্পের আওতায় এক হাজার সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন করছে, যা মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্মকে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, তেমনি অনিরাপদ খাবার গ্রহণের কারণে দেহে ক্যানসার, কিডনি রোগ ও বিকলাঙ্গতাসহ অনেক রোগ বাসা বাঁধে। নিরাপদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান করা জরুরি। ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত ১৩টি বিধিবিধান তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান গাজীপুরের সফীপুরে আনসার ভিডিপি একাডেমিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত '৪২তম জাতীয় সমাবেশ ২০২২'-এ কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আনসার সদস্যদের মাঝে পদক পরিয়ে দেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ও সচিবালয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিগণ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কাজ নিয়ে বিদেশে যেতে আগ্রহীরা যেন প্রতারণার শিকার না হন, সে বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন। একইসঙ্গে তিনি বিদেশে যেতে জমি বিক্রি না করে প্রয়োজনে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দেওয়ার আহ্বান জানান। সরকারের অনুমতি ছাড়া বাড়ির গাছও কাটা যাবে না– এমন বিধান রেখে 'বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন ২০২২'-এর খসড়া অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশে কর্মসংস্থান নিশ্চিতের ব্যবস্থা করার কথাও বলেন। তিনি বলেন, দেশে বেজার ১০০টি পার্ক হচ্ছে। সেখানে লাখ লাখ লোকের প্রয়োজন হবে। নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি গাজীপুরের আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪২তম জাতীয় সমাবেশে যুক্ত হন। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শান্তির দেশ। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলেই দেশের উন্নয়ন হয়। দেশের উন্নয়ন মানে প্রতিটি পরিবারের উন্নয়ন। আর এলক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের পক্ষে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। আনসার-ভিডিপি সদস্য অসুবিধায় বা বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়লে যাতে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায় সেলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ আনসার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' নামে একটি ফান্ড গঠন করা হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে আনসার-ভিডিপির ১৬২ জন সদস্যকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পদক প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

প্রতিটি বিভাগে মেরিন একাডেমি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ই ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে চট্টগ্রামে মেরিন একাডেমি প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৫৬তম ব্যাচের ক্যাডেটদের 'মুজিববর্ষ গ্র্যাজুয়েশন প্যারেড' অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেকার সমস্যা দূর করতে দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে বরিশাল, সিলেট, পাবনা ও রংপুরে মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সুনাম ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই ফেব্রুয়ারি শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদর দফতরে 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ২৭তম জয়ন্তী ও কোস্ট গার্ড দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কোস্ট গার্ড সদস্যদের কাজের প্রশংসা করেন। এই বাহিনীর ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং তাদের সার্বিক কল্যাণে তাঁর সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী। পরে চার কোস্ট গার্ড সদস্যদের সাহসিকতা ও বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পদক প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

ষাটোর্ধ্বদের পেনশনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি-বেসরকারিসহ সব ধরনের অনানুষ্ঠানিক খাতের ষাটোর্ধ্ব জনগণের জন্য একটি সর্বজনীন পেনশন স্কিম প্রণয়ন এবং কর্তৃপক্ষ স্থাপনের নির্দেশনা দেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি গণভবনে অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তন' বিষয়ক একটি উপস্থাপনা অবলোকনকালে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

মার্চের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সবার জন্য সেট টপ বক্স

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, দেশে টিভি ক্যাবল নেটওয়ার্ককে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ৩১শে মার্চের মধ্যে ক্যাবল অপারেটরবৃন্দ ঢাকা ও চট্টগ্রামে সব গ্রাহকের কাছে ডিজিটাল সেট টপ বক্স পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেবে। এর পরের ধাপে ৩১শে মে-এর মধ্যে সমস্ত বিভাগীয় এবং মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় ক্যাবল অপারেটরবৃন্দ সুলভমূল্যে গ্রাহকদের এই বক্স সরবরাহ করবে বলেও জানান মন্ত্রী। ১লা ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে টিভি ক্যাবল অপারেটর, ডিটিএইচ সেবাদাতা ও এসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স– এটকো প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা শেষে সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান তিনি। মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব খাদিজা বেগম, এটকোর সিনিয়র সহসভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও শীর্ষ ক্যাবল অপারেটরবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৪ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল দিবস ২০২২' উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ক্যাবল অপারেটর এবং ডিটিএইচ সেবাদাতা এবং এটকো প্রতিনিধিবৃন্দকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে টিভি ক্যাবল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল করার উদ্যোগ বাস্তবায়নার্থে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উদ্যোগ গ্রহণের পর হাইকোর্টের একটি স্থগিতাদেশ ছিল, মন্ত্রণালয় থেকে আবেদনের পর হাইকোর্ট আদেশটি স্থগিত করেছে। এখন ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। নির্ধারিত সময়ে যারা ডিজিটাল সেট টপ বক্স নেবেন না তারা অনেকগুলো টিভি চ্যানেল থেকে বঞ্চিত হবেন উল্লেখ করে বিষয়টি মানুষকে জানাতে সকল টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারের জন্য এটকোর প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইনের আলোকে একটি নীতিমালা এবং পরামর্শক কমিটি করার ব্যাপারেও আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেটি করা হবে বলেও জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমি আরও একটি উদ্যোগ নিয়েছি, ইতোমধ্যে মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির সাথে কথা বলেছি, তারা যাতে এখানে সেট টপ বক্স তৈরি করতে পারে। তারা সেই উদ্যোগ নিচ্ছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী আরও বলেন, ক্যাবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল করতে না পারার কারণে এই মাধ্যমের সাথে যারা যুক্ত তারা যেমন বঞ্চিত হচ্ছে, এর সাথে দেশও বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারের প্রাপ্য ভ্যাট-ট্যাক্স ঠিকভাবে আদায় হয় না। যারা গ্রাহককে আরও ভালো সেবা দিতে চায়, তারাও যাতে ন্যায্য হিস্যাটা পায় এবং রাষ্ট্র যাতে বঞ্চিত না হয় এবং সবার ওপরে গ্রাহকরা যাতে ভালো সেবা পায়, সেজন্য আমরা এই মাধ্যমটিকে ডিজিটাল করতে চাই।

সাংবাদিকদের অনুদান ও করোনাকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ৮ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের বঙ্গবন্ধু হলে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে ৪১ জন সাংবাদিককে ৩৯ লাখ টাকা কল্যাণ অনুদান ও ১৪ জনকে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার করোনাকালীন আর্থিক সহায়তা চেক প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ বাদল, সদস্য কলিম সরওয়ার, বিএফইউজের সহসভাপতি শহিদুল আলম, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. সামশুল ইসলাম, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি আলী আব্বাস, সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদসহ চট্টগ্রামের সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বছরে ৪০০০ বাংলাদেশি কর্মী নেবে গ্রিস

কৃষি খাতে কাজের জন্য বাংলাদেশ থেকে বছরে চার হাজার নতুন কর্মী নেবে গ্রিস। ৯ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গ্রিসের সঙ্গে এ বিষয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এবং সফররত গ্রিসের অভিবাসনমন্ত্রী নতিস মিতারাচি। সমঝোতা স্মারক সইয়ের পর ইমরান আহমদ বলেন, এই চুক্তিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের কর্মীরা নিরাপদে গ্রিসে গিয়ে বৈধভাবে কাজ করতে পারবেন। বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিয়োগকারীর ব্যয়ে কর্মীরা গ্রিসে যেতে পারবেন। সমঝোতা অনুযায়ী তাদের পাঁচ বছর মেয়াদি ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে উভয় দেশ আলোচনাক্রমে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতে কর্মীর সংখ্যা বাড়াবে।

প্রবাস আয়ে এশিয়ায় পঞ্চম বাংলাদেশ

করোনা মহামারিতে বিশ্বজুড়ে প্রবাস আয় কমলেও এ খাতে সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। বিদেশে এ দেশের শ্রমিক কমলেও প্রবাসীরা ২০২০ সালে বিপুল অঙ্কের অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। বিশেষ করে সরকারের পক্ষ থেকে প্রণোদনা দেওয়ায় বৈধ চ্যানেলে অর্থ প্রেরণে উৎসাহিত হয়েছেন প্রবাসীরা। ৯ই ফেব্রুয়ারি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রকাশিত 'এশিয়ান ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশন রিপোর্ট ২০২২' প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, ২০২০ সালে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রবাস আয় আসে ৩১৪.৪ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ২১.৭ বিলিয়ন ডলার আয় করে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ৮৩.১ বিলিয়ন ডলার আয় করে প্রথম স্থানে ভারত। এছাড়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চীন, ফিলিপাইন ও পাকিস্তান।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এই পাঁচ দেশ ২০২০ সালে মোট রেমিটেন্স পেয়েছে ২২৪.৪ বিলিয়ন ডলার, যা বৈশ্বিক আয়ের ৩২ শতাংশ ও আঞ্চলিক আয়ের ৭১.৭ শতাংশ। বলা হয়, বাংলাদেশে প্রবাসী শ্রমিক কমে ২০২০ সালে হয়েছে দুই লাখ ১৭ হাজার ৩৬৯ জন, যেখানে ২০১৭ সালেই ছিল ১০ লাখ। তবে প্রবাসী শ্রমিক কমলেও এ দেশে রেমিটেন্স প্রবাহ জোরালো হয়েছে। রেমিটেন্স অর্জনে মাসিক ও বার্ষিক হিসেবে রেকর্ড দেখা যাচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বিশ্বের অর্জিত রেমিটেন্সের তুলনায় ২০২০ সালের অর্জিত রেমিটেন্স ২.৩ শতাংশ কম। অন্যান্য অঞ্চলে রেমিটেন্স প্রবাহ কমলেও ২০২০ সালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ এশিয়ায় যথাক্রমে বেড়েছে ১৪.৪ শতাংশ ও ৫.২ শতাংশ। এছাড়া ২০২১ সালে এশিয়ায় রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে ২.৫ শতাংশ।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

আবারো দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশ

মহামারি করোনার মধ্যে কড়া সমালোচনার মুখেও গার্মেন্ট ব্যবসায়ীরা কারখানা খোলা রেখেছিলেন। এখন তার ফল পাওয়া যাচ্ছে। তৈরি পোশাকের বিশ্ব বাণিজ্যে চীনের পরের অবস্থান, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানিকারক দেশের মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশ। এই প্রতিযোগিতায় ভিয়েতনামকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালের শেষে ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ৪৭২ কোটি ডলার বেশি। ২২শে ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

তৈরি পোশাকের বিশ্ব বাণিজ্যে অনেক দিন ধরেই তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে। এ প্রতিযোগিতায় ভিয়েতনামকে আবারও ছাড়িয়ে গেল বাংলাদেশ। ২০২১ সাল শেষে ভিয়েতনামের চেয়ে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ৪৭২ কোটি ডলার বেশি। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং ভিয়েতনামের ট্রেড প্রমোশন কাউন্সিলের (ভিয়েট্রেড) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২১ সালে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল তিন হাজার ৫৮০ কোটি ডলার। একই বছর ভিয়েতনামের রপ্তানির মোট পরিমাণ তিন হাজার ১০৮ কোটি ডলার।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো স্ক্রল পেইন্টিং-এর উদ্‌বোধন

জাতির পিতার জীবনভিত্তিক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো স্ক্রল পেইন্টিং 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: মহাজীবনের মহাপট' শীর্ষক পক্ষকালব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭শে ফেব্রুয়ারি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে এ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য এ উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি। জাতির পিতার বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক জীবনকে তুলে ধরে এ স্ক্রল পেইন্টিং করেছেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শাহ্‌জাহান আহমেদ বিকাশ। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: মহাজীবনের মহাপট' শীর্ষক ১৫০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল পেইন্টিংটি বাংলাদেশে সম্পাদিত সবচেয়ে বড়ো পটভূমিতে জাতির পিতার জীবনভিত্তিক চিত্রকর্ম। জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রদর্শনী গ্যালারিতে চিত্রকর্মটি পক্ষকালব্যাপী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিত্রকর্মটির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, শিল্পীর তুলির আঁচড়ে ফুটে উঠেছে আমাদের বাংলাদেশের সংগ্রাম থেকে অর্জনের ইতিহাস। শুধু বর্ণমালা না, শিল্পীর তুলিতেও মানুষ এটা দেখতে পারবে, উপলব্ধি করতে পারবে, শিখতে পারবে।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ফ্রিল্যান্সারদের সম্মাননা প্রদান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশে প্রযুক্তি উদ্যোক্তা সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। সরকার রেমিটেন্স যোদ্ধা হিসেবে ফ্রিল্যান্সারদের অসামান্য কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। প্রতিমন্ত্রী ১৮ই ফেব্রুয়ারি জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে 'লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় ৪২ জন সফল ফ্রিল্যান্সারদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা দেশজুড়ে অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সরকার শক্তিশালী স্তম্ভের ওপর দাঁড় করিয়েছে। দেশে তিন লাখ উদ্যোক্তা ই-কমার্স খাতে কাজ করছেন। সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সারসহ ২০ লাখ তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বলে তিনি জানান। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের ফ্রিল্যান্সাররা বর্তমানে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের আর্কিটেক্ট সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় ২০২৫ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি আয় পাঁচ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ চাঁদপুরের দক্ষিণ মতলব উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

তিনশো স্কুল অব ফিউচার ও ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইসিটি বিষয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি বলেন, শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদ ও সমস্যা সমাধানমুখী চিন্তার বিকাশ ঘটাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কারিকুলামে কোডিং চালু করার বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় আইটি, এআর, ভিআর, বিগডাটা অ্যানালেটিকস, রোবটিকস্, ব্লকচেইন এবং নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে দেশে তিনশো স্কুল অব ফিউচার ও শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালে জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী জাতি ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আইটি বিষয়ক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশের তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার মান প্রমিত করেছে বাংলাদেশ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, বিশ্বের ৩৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষীর জন্য বাংলাদেশই হচ্ছে বাংলা ভাষার রাজধানী। বাংলাদেশই ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলার এনকোডিং ও কীবোর্ড-এর মান প্রমিত করেছে। শেখ হাসিনাই বাংলার ১৬টি টুলস উন্নয়নে ১৫৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছেন যার কাজ চলমান। মন্ত্রী ২রা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রযুক্তি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা *কম্পিউটার জগৎ*-এর আয়োজনে ডিজিটাল দুনিয়ায় বাংলা লিপি ব্যবহারের সংকট ও সমাধান বিষয়ক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

দেশের প্রথম অনলাইন বাংলা সংবাদ সংস্থা *আবাস*-এর চেয়ারম্যান মোস্তাফা জব্বার জানান, বাংলা প্রকাশনা এক সময়ে কলকাতানির্ভর ছিল। এখানে টাইপফাউন্ড্রিও ছিল না। টাইপসেটার ও অন্যান্য প্রযুক্তির কেন্দ্র ছিল কলকাতা। বঙ্গবন্ধু প্রথম ১৯৭২ সালে শহিদ মুনীর চৌধুরী উদ্ভাবিত কীবোর্ড অনুসরণ করে অপটিমা মুনীর টাইপরাইটার প্রবর্তন করেন। এরপর প্রকাশনায় বাংলা আসে ও বাংলাদেশের প্রকাশনায় বিপ্লব ঘটে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বাজার বড়ো হচ্ছে ভারতে

করোনার মধ্যেও বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশ ভারতের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) ৩৬ কোটি ৫৯ লাখ মার্কিন ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে দেশটিতে, দেশীয় মুদ্রায় যা ৩ হাজার ১৪৬ কোটি টাকার সমান। ভারতের বাজারে এই রপ্তানি আগের অর্থবছরের (২০২০-২০২১) একই সময়ের চেয়ে ৫৮ শতাংশ বেশি।

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র তথ্যানুযায়ী, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৪৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল। পরের বছর করোনার কারণে সেই রপ্তানিতে ধাক্কা লাগে। টানা দুই অর্থবছর ৪২ কোটি ডলার করে মোট ৮৪ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়। চলতি অর্থবছরে ওমিক্রনের শঙ্কার মধ্যেও প্রথম ৬ মাসেই প্রায় ৩৭ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছে। বিজিএমইএর সভাপতির মতে, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে পোশাকের মূল্য আগের চেয়ে কিছুটা বাড়তি। তারপরও ভারতের বাজারে রপ্তানি আয়ের পাশাপাশি রপ্তানি হওয়া পোশাকের পরিমাণ বেড়েছে।

আসবাবে বদলে গেছে শেরপুরের সাত গ্রাম

দারিদ্র্য বিমোচনে আসবাবশিল্পের বড়ো ভূমিকা আছে। শেরপুর সদর উপজেলার সাতটি গ্রামে গড়ে উঠেছে আসবাব তৈরির প্রায় ৩০০ কারখানা। এসব কারখানার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ। এ খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে এখানকার আসবাব বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব।

কয়েকজন কাঠমিস্ত্রি শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার গারো পাহাড়ের বনে রোপিত আকাশমণি কাঠ স্বল্পমূল্যে কিনে শেরীপাড়া গ্রামে গড়ে তোলেন আসবাব তৈরির ৮ থেকে ১০টি কারখানা। এসব কারখানায় যুক্ত হন শতাধিক কাঠ, নকশা ও রংমিস্ত্রি। ক্রমান্বয়ে কারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে জেলা সদরের শেরীপাড়া, পূর্বশেরী, পশ্চিমশেরী, অষ্টমীতলা, মধ্যবয়ড়া, বয়ড়াপরানপুর ও কুসুমহাটি গ্রামে গড়ে উঠেছে আসবাব তৈরির প্রায় ৩০০ কারখানা। এসব কারখানায় কাঠ জোগান দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয়েছে ২০ থেকে ২৫টি স মিল।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগ

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় মোট ৩৬ হাজার ১৩৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২ হাজার ৬৫ জন এবং বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় ৩৪ হাজার ৭৩ জন

সহকারী শিক্ষক ও প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে '২০২১ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল' গ্রহণ করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

ইউনিক আইডি হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য 'ইউনিক আইডি'র উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নেতৃত্বে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে। ইউনিক আইডি তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিচিতি নাম্বার পাবে। এতে শিক্ষার্থীদের ভর্তিসহ যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। ফলে দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির ক্ষেত্রে সনদ যাচাইয়ে কোনো ধরনের সমস্যায় পড়তে হবে না। ১লা ফেব্রুয়ারি এ সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ। তিনি ইউনিক আইডিকে শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করে দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

এইচএসসির ফল প্রকাশ

এইচএসসি ও সমমান ২০২১ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার জন্য ১৩ই ফেব্রুয়ারি সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠানের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে ফলাফল ঘোষণা করেন। এ বছর পরীক্ষার নম্বর ও সময় কমিয়ে মাত্র তিনটি বিষয়ের ছয়টি পত্রে নেওয়া হয়। নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে মোট ১৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৮১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাস করে ১৩ লক্ষ ৬ হাজার ৭১৮ জন। পাসের হার ৯৫.২৬ শতাংশ। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১ লাখ ১৫ হাজার ৭০৫ জন। পাস করেছে ১০ লাখ ৬৬ হাজার ২৪২ জন। পাসের হার ৯৫.৫৭ শতাংশ। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৬ হাজার ৫৭৯ জন। পাস করেছে ১ লাখ ১ হাজার ৭৬৮ জন। পাসের হার ৯৫.৪৯ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৩৯৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭০৮ জন। পাসের হার ৯২.৮৫ শতাংশ। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হারের শীর্ষে যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। আর জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবার শীর্ষে ঢাকা বোর্ড। এবারের পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের পাসের হার বেশি। ছেলেদের পাসের হার ৯৪.১৪ শতাংশ আর মেয়েদের পাসের হার ৯৬.৪৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও মেয়েরা এগিয়ে। জিপিএ-৫ পেয়েছে মেয়ে ১ লাখ ২ হাজার ৪০৬ জন এবং ছেলে ৮৬ হাজার ৭৬৩ জন।

প্রতিবেদন : মো. সেলিম

বিনিয়োগ: বিশেষ প্রতিবেদন

মালয়েশিয়ার সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের ওপর বাণিজ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, মালয়েশিয়ার সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করা প্রয়োজন। এফটিএ স্বাক্ষরের বিষয়ে উভয় দেশের আলোচনা অনেক এগিয়ে গেছে। এতে উভয় দেশ উপকৃত হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী ২৪শে ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে তার অফিস কক্ষে বাংলাদেশে সফররত মালয়েশিয়ার প্ল্যান্টেশন, ইন্ডাস্ট্রি এবং কমোডিটি বিষয়ক মন্ত্রী দাতুক হাজাহ জুরাইদা বিনতে কামারুদ্দিন (Datuk Hajah Zuraida Binti Kamarunddin)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক, পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক, হালকা যন্ত্রপাতি ও চামড়াজাত পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্য মালয়েশিয়ায় রপ্তানি করছে বলে বাণিজ্যমন্ত্রী এসময় জানান।

মালয়েশিয়ার মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার বন্ধুরাষ্ট্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক অংশীদার। উভয় দেশের চলমান ব্যাবসাবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে মালয়েশিয়ার ফার্নিচার, রাবারজাত পণ্য, চকলেট ও শুকনো খাদ্যপণ্যের চাহিদা বাংলাদেশে রয়েছে। উভয় দেশ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে পারে। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আগ্রহী।

বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিনিয়োগ করুন

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিনিয়োগের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি প্রক্রিয়াজাত, ভ্যালু অ্যাড ও রপ্তানিতে বিদেশি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে এবং সরকার সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। ২২শে ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে কৃষির উন্নয়ন, রপ্তানি ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা শীর্ষক

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। দুবাই ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে ফুড, এগ্রিকালচার ও লাইভলিহুডস সপ্তাহ উপলক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এ সেমিনারের আয়োজন করে।

কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ আজ অনেক ফসলে উদ্বৃত্ত। শাকসবজি, ফলমূল, মাছসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানির সম্ভাবনাও অনেক। নিরাপদ কৃষিপণ্য উৎপাদন, অ্যাক্রেডিটেড ল্যাব স্থাপন ও সার্টিফিকেট প্রদানসহ অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা বাংলাদেশ থেকে কৃষিপণ্য রপ্তানিতে এগিয়ে আসুন। সরকার সকল সহযোগিতা প্রদান করবে।

প্রতিবেদন: এইচ কে রায় অপু

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার বাংলাদেশে সর্বোচ্চ

বাংলাদেশে ৬৫ শতাংশ নারী তাদের শিশু ও নবজাতকদের পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত শুধু বুকের দুধ খাওয়ান। এ হার বাংলাদেশসহ বিশ্বের আট দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফের) এক জরিপ প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ইউনিসেফের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ জরিপ সম্পর্কে জানানো হয়। 'ফর্মুলা দুধের বিপণন কীভাবে শিশুকে খাওয়ানোর বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে' শীর্ষক জরিপটি বাংলাদেশসহ আটটি দেশে মা-বাবা, অন্তঃসত্ত্বা নারী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার ভিত্তিতে করা হয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী মা-বাবা ও অন্তঃসত্ত্বা নারীদের অর্ধেকের বেশি (৫১ শতাংশ) বলেছেন, তারা ফর্মুলা দুধ তৈরিকারক কোম্পানিগুলোর 'লক্ষ্যনির্দিষ্ট' বিপণন কার্যক্রমের শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশগুলো হলো– চীন, মেক্সিকো, মরক্কো, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনাম। এসব দেশের বিভিন্ন শহরের সাড়ে ৮ হাজার মা-বাবা ও অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং ৩০০ স্বাস্থ্যকর্মীর ওপর পরিচালিত হয় এ জরিপ।

গ্রাঁ প্রি শুটিংয়ে নাফিসার পদক লাভ

ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় গ্রাঁ প্রি শুটিংয়ে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে মেয়েদের বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন বাংলাদেশের নাফিসা তাবাসসুম। আন্তর্জাতিক স্পোর্ট ফেডারেশনের সরাসরি আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্টে নাফিসার এ পদকটিই বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড়ের প্রথম পদক। ১১ই ফেব্রুয়ারি গ্রাঁ প্রি শুটিংয়ের দ্বিতীয় দিনে ৩৭ স্কোর করে এ পদক জিতেছেন তিনি। বিকেএসপির এ ছাত্রী ২০১৬ সালে দক্ষিণ এশিয়ান গেমসে ৫০ মিটার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জয়ী বাংলাদেশ দলের অন্যতম খেলোয়াড় ছিলেন। আর ২০২১ সালে বাংলাদেশ গেমসে মেয়েদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে সোনা জিতেছিলেন নাফিসা।

যুক্তরাষ্ট্রে বিচারক পদে প্রথম মুসলিম নারী

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতের বেঞ্চের নিয়োগের জন্য যে আট জন বিচারককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের বংশোদ্ভূত এক মার্কিন মুসলিম নারী। নাম নুসরাত জাহান চৌধুরী। ১৯শে জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফেডারেল জাজ হিসেবে নতুন আট বিচারককে মনোনয়ন দেন বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। নুসরাত চৌধুরী বর্তমানে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন অব ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের আইন বিষয়ক পরিচালক পদে কর্মরত আছেন। নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টে ফেডারেল জাজ এ দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে তিনিই হবেন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান ও প্রথম মুসলিম নারী।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ স্মার্টকার্ড দিবে নির্বাচন কমিশন

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষায়িত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দিবে নির্বাচন কমিশন। উদ্‌বোধনী দিনে ১০০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে এই জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। ১২ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) শাহাদাত হোসেন চৌধুরী বলেন, বিশেষায়িত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্রে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' কথাটি লেখা থাকবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা সংগ্রহ করে দেশের সব মুক্তিযোদ্ধাকে এই স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। বর্তমানে দেশে গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা প্রায় এক লাখ ৮৩ হাজার ৫৬০ জন। যেসব মুক্তিযোদ্ধা আগে স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র পেয়েছেন, তাঁদেরও পর্যায়ক্রমে এই বিশেষ মর্যাদা পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

বাড়ি পাবেন নারী মুক্তিযোদ্ধারা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, নারী মুক্তিযোদ্ধারা সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ লাখ টাকা ব্যয়ে বাড়ি পাবেন। এর আগে ৬৭ জন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা দেওয়া হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'মহিলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা ২০২২' অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেক সরকারি হাসপাতালে ৩০ থেকে ৫০ লাখ টাকা অগ্রিম জমা করে রেখেছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা যাতে বিনা পয়সায় শতভাগ চিকিৎসা পান। কোনো মুক্তিযোদ্ধা বিনা চিকিৎসায় থাকবেন না। তিনি আরও বলেন, আমাদের মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা দেওয়া আছে। মুক্তিযোদ্ধারা রাষ্ট্রীয় কী কী সুযোগ-সুবিধা পাবেন ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষক পাবেন স্মার্ট কার্ড

এক কোটি ৬২ লাখ কৃষককে স্মার্ট কার্ড দেবে সরকার। সরকারের কাছ থেকে প্রণোদনা নেওয়ার সময় কৃষককে এ কার্ড দেখাতে হবে। একইসঙ্গে কৃষিতে সরকারের সার, বীজসহ যত ধরনের সুবিধা আছে, স্মার্ট কার্ড দেখিয়ে সেসব সুবিধা নিতে হবে কৃষকদের। ৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। 'স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট)' শিরোনামের প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হবে ১০৭ কোটি টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদের জন্য এই কার্ড তৈরি করবে।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ চত্বরে আয়োজিত 'জাতীয় সবজি মেলা ২০২২' উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন– পিআইডি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি কৃষি অঞ্চলের ৯টি জেলা–গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বরিশাল, যশোর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বান্দরবান ও ময়মনসিংহের সব উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকার কৃষকদের এ কার্ড দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে অন্য অঞ্চলের কৃষকদেরও এ সেবার আওতায় আনা হবে।

সারের ভরতুকিতে লাগবে গত বছরের তুলনায় চারগুণ

এ বছর দেশে সারের ভরতুকিতে লাগবে ২৮ হাজার কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় চারগুণ এবং ইতোমধ্যে ১৯ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে সারের মজুত, দাম, ভরতুকিসহ সার্বিক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী এসব তথ্য জানান। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলামসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, কোভিড পরিস্থিতির প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সারের মূল্য অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। তাছাড়া জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজ ভাড়াও প্রায় দুইগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে ভরতুকি দাঁড়িয়েছে প্রতি কেজি ইউরিয়া ৮২ টাকা, টিএসপি ৫০ টাকা, এমওপি ৪১ টাকা এবং ডিএপিতে ৭৯ টাকা। এ বিশাল অঙ্কের ভরতুকি প্রদানে চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে লাগবে ২৮ হাজার কোটি টাকা। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভরতুকিতে লেগেছিল ৭ হাজার ৭১৭ কোটি টাকা। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোথাও এত ভরতুকি দেওয়ার উদাহরণ নেই। বছরে ২৮ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে আরেকটি পদ্মা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব। ভরতুকি কমাতে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার চাপও রয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সংস্থার আপত্তি উপেক্ষা করে ভরতুকি দিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার সার, সেচ, বীজ, বালাইনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ উৎপাদন, আমদানি, বিতরণসহ সার্বিক ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। কৃষি উপকরণের দাম যেমন কমিয়েছে তেমনি সহজলভ্য করে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। গত ১৩ বছরে সারসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের কোনো সংকট হয়নি। ফলে কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৫৫.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন, পেঁয়াজ ৩৩.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পাট ৭৭.২৫ লক্ষ বেল উৎপাদিত হয়েছে। এসব সাফল্যের পেছনে সারের দাম কমানো ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বিরাট ভূমিকা রেখেছে। কৃষিমন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সার, সেচসহ কৃষি উপকরণে মোট ৮৮ হাজার ৮২৮ কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করেছে।

প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

টিআরের টাকায় হবে বজ্রনিরোধক ছাউনি

সোলার প্যানেল, ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার পর এবার টেস্ট রিলিফের (টিআর) টাকায় হবে 'লাইটনিং অ্যারেস্টার' বা বজ্রপাত নিরোধক যন্ত্র। বজ্রপাতপ্রবণ এলাকার জনগুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থাপন করা হবে বজ্রনিরোধক দণ্ড, বজ্রনিরোধক যন্ত্র বা বজ্রপাত নিরোধক ছাউনি। বজ্রপাতে মৃত্যু ঠেকাতে তালগাছ লাগানোর পর এবার নতুন এ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এজন্য বিষয়টি বিদ্যমান গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা ২০২১-এ অন্তর্ভুক্ত করে আদেশ জারি করেছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইতোমধ্যে আদেশের কপি সব জেলা প্রশাসক (ডিসি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের (পিআইও) কাছে পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১০ বছরে বজ্রপাতে দেশে কমবেশি আড়াই হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গত বছরও বজ্রপাতে মারা গেছেন আড়াই শতাধিক মানুষ।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় বজ্রনিরোধক দণ্ড, বজ্রনিরোধক যন্ত্র ও বজ্রপাত নিরোধক ছাউনি স্থাপন করা হবে। এর আগে টিআর খাতের টাকায় সিসি

ক্যামেরা কেনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে পরিপত্র জারি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়েছিল– টিআর কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থে গ্রামীণ রাস্তাঘাট উন্নয়নসহ বিভিন্ন শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের পাশাপাশি সব নির্বাচনি এলাকার জনসাধারণের জানমালসহ সার্বিক নিরাপত্তা এবং সরকারি সম্পদ রক্ষায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে এবং জনবহুল স্থানে 'ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়নের জনস্বার্থে পরিপত্র জারি করা হলো। এরও আগে টিআরের টাকায় সোলার প্যানেল সরবরাহ করত সরকারি প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)।

প্রতিবেদন : সানজিদা আহমেদ

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

করোনায় সংক্রমণ ও মৃত্যু দুটোই কমেছে

দেশে প্রায় একমাস পর করোনা শনাক্তের হার, দৈনিক মৃত্যু দুটোই কমেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত জানুয়ারি মাসে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৮০ শতাংশের শরীরে ওমিক্রন ও ২০ শতাংশের শরীরে ডেল্টা ধরন শনাক্ত হয়েছে। সংক্রমণের শুরু থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশে মোট ১৮ লাখ ৯৯ হাজার ৮০৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ২৮ হাজার ৭৭১ জনের। আর সুস্থ হয়েছে ১৬ লাখ ৫৫ হাজার ৯৮১ জন।

অন্তঃসত্ত্বা মা টিকা নিলে সুরক্ষা পায় সন্তান

অন্তঃসত্ত্বা মা করোনার টিকা নিলে সুরক্ষা পেতে পারে জন্ম নেওয়া শিশু। টিকা নেওয়ার পর জন্ম নেওয়া শিশুদের শরীরে অ্যান্টিবডি পেয়েছেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য জার্নাল অব দ্য আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (জেএএমএ) ৭ই ফেব্রুয়ারি অনলাইন সংস্করণে একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।

গবেষণা ফলাফলে বলা হয়েছে, টিকা নেওয়া মায়েদের সন্তানদের শরীরে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি করোনায় আক্রান্ত মায়ের সন্তানদের শরীরে থাকা অ্যান্টিবডির চেয়ে বেশি, অন্তত ছয় মাস পর্যন্ত তা দেখা যাচ্ছে। আর টিকা নেওয়া মায়েদের অ্যান্টিবডির পরিমাণ করোনার উপসর্গ থাকা মায়েদের চেয়ে ভালো। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনের দুটি হাসপাতালে করোনার টিকা নেওয়া ৭৭ জন আক্রান্ত অন্তঃসত্ত্বা এবং ১২ জন করোনায় আক্রান্ত অন্তঃসত্ত্বা মায়ের ওপর এ গবেষণা পরিচালিত হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক ১০ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে 'বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২২' উপলক্ষে আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

টিকা পেল ভাসমান লোকজন

যাদের জন্মনিবন্ধন কিংবা জাতীয় পরিচয়পত্র নেই, নেই কোনো স্থায়ী ঘর বা ঠিকানা– এমন ভাসমান লোকজনকে করোনাভাইরাসের টিকা দেওয়া হয়েছে। ৭ই ফেব্রুয়ারি কমলাপুর রেলস্টেশনে ভাসমান মানুষদের টিকাদানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয়। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে যেখানে ভাসমান লোকজন থাকেন, সেসব জায়গায় এ টিকা দেওয়ার কাজটি পরিচালনা করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক। টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নাম, পিতার নাম ও বয়স লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। যারা নাম স্বাক্ষর করতে পারবেন, তাদের স্বাক্ষর এবং না পারলে টিপসই নিয়ে সবাইকে কার্ড দেওয়া হচ্ছে।

পরিবহণ শ্রমিকদের টিকা কার্যক্রম শুরু

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্ধারিত চারটি হাসপাতালে পরিবহণ শ্রমিকদের করোনার টিকা দেওয়া হচ্ছে। ১৯শে জানুয়ারি মহাখালী বাস টার্মিনালে শ্রমিকদের টিকা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমদিকে বাস টার্মিনালে টিকা দেওয়া হলেও পরে কাছাকাছি চারটি হাসপাতালকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ শ্রমিকদের টিকাদান কর্মসূচি সমন্বয় করছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নিয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

আইসোলেশন ১০ দিন, বুস্টার ডোজ ৪০ বছরে

করোনা শনাক্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তি ১০ দিন আইসোলেশন বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবেন। ১০ দিন পর উপসর্গ না থাকলে করোনা মুক্ত সনদ ছাড়াই তিনি কাজে ফিরতে পারবেন। আর বয়স ৪০ হলেই যে-কোনো ব্যক্তি টিকার বুস্টার ডোজ নিতে পারবেন। ৩০শে জানুয়ারি মহাখালীতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বুস্টার ডোজের জন্য আগে বয়সসীমা ছিল ৫০ বছর। বয়সসীমা কমিয়ে ৪০ বছর করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত ভার্চুয়াল স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়, করোনায় আক্রান্তের ১০ দিন পর জ্বর ভালো হয়ে গেলে, উপসর্গ চলে গেলে কাজে ফেরা যাবে। পরীক্ষা সনদ লাগবে না।

প্রতিবেদন : মো. আশরাফ উদ্দিন

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

মোটরযান চালকদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক

পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের আবেদনপত্রের সঙ্গেই দিতে হবে ডোপ টেস্ট সনদ। ৩০শে জানুয়ারি থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। এর ফলে ২০২০ সালের ২২শে অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবসের অনুষ্ঠানে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চালকদের ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার বাস্তাবায়ন হলো।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে গত ১৩ই জানুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল রাষ্ট্রীয় এই সংস্থাটি। সেখানে ডোপ টেস্ট ছাড়া কোনো পেশাদার চালক আর লাইসেন্স পাবেন না বলে উল্লেখ করা হয়। এতে আরও বলা হয়, ডোপ টেস্ট রিপোর্ট/সনদ পজিটিভ হলে (মাদক সেবনের আলামত পাওয়া গেলে) বা এতে কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকলে সেক্ষেত্রে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হবে না। এই ডোপ টেস্ট সারা দেশে সব পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে এবং ঢাকা মহানগরীর ক্ষেত্রে ছয়টি প্রতিষ্ঠানে (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) ও কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল) করা যাবে। পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ, নবায়নকালে ডোপ টেস্ট করার জন্য বিআরটিএর সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে যোগাযোগ করার জন্যও বলা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তিতে।

বদলে যাচ্ছে চট্টগ্রাম আউটার রিং রোড

সমুদ্র উপকূল ভাগের সাগরপাড় ঘেঁষে তৈরি হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন চট্টগ্রাম আউটার রিং রোড। রোডটিকে প্রথম দর্শনে যে কেউ উন্নত বিশ্বের কোনো সড়ক ভেবে ভুল করবেন। অথচ এ রোডের নির্মাণকাজ এখনো পুরোপুরি শেষই হয়নি! এরপরও রোডটি যানজট মুক্ত হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর, পতেঙ্গা, ইপিজেড ও শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাতায়াতকারীদের অন্যতম ভরসায় পরিণত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) দাবি, আউটার রিং রোড পুরোদমে চালু হলে বদলে যাবে নগরীর যানজট চিত্র। এ সড়ক চালিকাশক্তিতে পরিণত হবে চট্টগ্রাম বন্দর, বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরীসহ মেগা সব প্রকল্পের।

যানজট কমাতে নতুন উদ্যোগ

কুমিল্লা নগরীতে যানজট কমিয়ে আনতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সিটি করপোরেশন। ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে। ৩০শে জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী ড. সফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পুলিশ লাইনস-ঝাউতলা-বাদুড়তলা-কান্দিরপাড়-রাজগঞ্জ-চকবাজার রোডে বা রোডের দুই পাশে ফুটপাথের সব অবৈধ দোকান, যানবাহন, স্থাপনা ও অন্যান্য সামগ্রী উচ্ছেদ করতে হবে। তাছাড়া পূবালী চত্বর থেকে সালাউদ্দিন মোড়, পূবালী চত্বর থেকে মর্ডান স্কুল, কান্দিরপাড়-সার্কিট হাউস- মোগলটুলী-চৌমুহনী-রাজগঞ্জ রোডের দুই পাশে ফুটপাথের সব অবৈধ দোকান, স্থাপনা ও অন্যান্য সামগ্রী উচ্ছেদ করতে হবে। কান্দিরপাড় কেন্দ্রের আশপাশের সব প্রধান সড়ক ও সড়কের দুই পাশে ফুটপাথের সব অবৈধ দোকান, যানবাহন, স্থাপনা ও অন্যান্য সামগ্রী উচ্ছেদ করতে হবে। সব শপিং কমপ্লেক্স ও মার্কেটের নিচতলায় পার্কিং থাকতে হবে। অন্যথায় কমপ্লেক্স ও মার্কেটের নিচতলার সব মালামাল জব্দ করে পার্কিংয়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সিটি করপোরেশনের মালিকানাধীন নিউমার্কেট ও সিটি মার্কেটের বারান্দা ও সামনের সব দোকান যানজট সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেগুলো উচ্ছেদ করা হবে। ইউনিভার্সিটি, স্কুল-কলেজ বা কোনো সংস্থার বড়ো বাস কান্দিরপাড় বা পূবালী চত্বর মোড় ক্রস করতে পারবে না। অটোরিকশা চলাচল সীমাবদ্ধ করতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

বিদ্যুৎ: বিশেষ প্রতিবেদন

দ্রুত বৈদ্যুতিক যন্ত্র নীতিমালা চূড়ান্তের সুপারিশ

বৈদ্যুতিক যান চার্জিং বিষয়ক নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করার সুপারিশ করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ২রা ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনে কমিটির সভা থেকে এ সংক্রান্ত সুপারিশ করা হয়। কমিটি সূত্র জানায়, বৈদ্যুতিক যান চার্জিং বিষয়ক খসড়া নীতিমালায় ইলেকট্রিক মোটরযানের জীবনকাল মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে ১০ বছর, তিন চাকার যানবাহন ৯ বছর ও হালকা, মধ্যম ও ভারী যানবাহনের জন্য ২০ বছর ধরা হয়েছে। অনুমোদিত চার্জিং স্টেশন, নিজস্ব ব্যবস্থাপনা, সোলার প্যানেল বা নবায়নযোগ্য যে-কোনো জ্বালানি ব্যবহার করে রিচার্জ করা যাবে। তবে ইলেকট্রিক মোটরযানের নিবন্ধন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন ও রুট পারমিট দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রচলিত পদ্ধতিতেই হবে।

বৈঠকে জানানো হয়, পেট্রোলচালিত যানবাহনের প্রতি এক হাজার কিলোমিটারের জন্য যেখানে পাঁচ হাজার ৩৭৫ টাকা খরচ হয়, সেখানে একই দূরত্বের জন্য বৈদ্যুতিক যানবাহনের ক্ষেত্রে খরচ হবে এক হাজার ২৫০ টাকা। এছাড়া পেট্রোলচালিত যানবাহনের চেয়ে বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের যান্ত্রিক দক্ষতা বেশি ও পরিবেশবান্ধব।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। বিদ্যুৎ খাত ক্রমাগতভাবে বড়ো হচ্ছে। এর ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। প্রতিমন্ত্রী ৯ই ফেব্রুয়ারি অনলাইনে ইউএস ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ইউএসটিডিএ) ও পাওয়ার সেলের মধ্যে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও বৈদ্যুতিক গ্রিডে স্মার্ট গ্রিডের অন্তর্ভুক্ত সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান নিয়ে চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি বলেন, স্মার্ট রোড ম্যাপটি স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত

করে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করবে এবং বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। যুক্তরাষ্ট্রের জ্ঞান এবং ধারণার আদান-প্রদান নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে আমাদের গ্রিডকে আরও নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিস্থাপক করে তুলবে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাবেন কৃষক

চলতি সেচ মৌসুমে বিদ্যুতের সম্ভাব্য চাহিদা ১৫ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট। সেচ মৌসুমে গ্যাসের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা প্রতিদিন ১ হাজার ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট, ফার্নেস অয়েলের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা ৭০ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন ও ডিজেলের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চাহিদা ধরা হয়েছে ৩০ হাজার ৭০০ মেট্রিক টন। সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। ৩০শে জানুয়ারি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ভার্চুয়ালি এ তথ্য জানানো হয়।

সভায় নসরুল হামিদ বলেন, সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে গ্যাস ও জ্বালানি তেলের জোগান অব্যাহত রাখবে। সুষ্ঠুভাবে লোড ব্যবস্থাপনা করা হবে। তিনি বলেন, প্রায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেচ মৌসুমে এই চাহিদা আরও বাড়ে। চাহিদা যতই বাড়ুক নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চাহিদা মতো প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জ্বালানি তেল সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন তিনি।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন সংগ্রহ

রেলভবনে ৬ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৪২০টি ব্রডগেজ ওয়াগন সংগ্রহের লক্ষ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ভারতের হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজনের উপস্থিতিতে ৬ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকায় রেলভবনে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং হিন্দুস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লি. ইন্ডিয়া-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়– পিআইডি

সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক মো. মিজানুর রহমান এবং ভারতীয় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রদীপ গুহ।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, অবিভক্ত ভারত থেকে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে রেল ব্যবস্থা পেয়েছি। রেলকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমান রেলওয়েকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কারণ বর্তমান সরকারের লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আত্মনির্ভরশীল, মর্যাদাকর দেশ গঠন করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি জনগণের কথা মাথায় রেখে সুদূরপ্রসারী চিন্তা থেকে রেলওয়েকে আলাদা মন্ত্রণালয় করে দিয়েছেন।

মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, সারা দেশের রেল যোগাযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন নদী ও সমুদ্রবন্দরের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে রেল যোগাযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ বাড়ানোর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের সকল সিঙ্গেল লাইনকে ডাবল লাইনে উন্নীত করা হবে। কারখানাগুলোকে আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। রেলওয়ের হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

জুনের মধ্যেই যান চলাচলের জন্য খুলবে পদ্মা সেতু

আগামী জুনের মধ্যেই বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্নের পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানান সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত সেতুর মূল কাজ হয়েছে শতকরা ৯৬ ভাগ, আর প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৯০ দশমিক ৫০ ভাগ। ১লা ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে তার কার্যালয়ে সেতু বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি জানান, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের তিনটি ফেজের মধ্যে এয়ারপোর্ট থেকে বনানী পর্যন্ত প্রথম ফেজের কাজ শেষ হয়েছে শতকরা ৭৮ দশমিক ৫০ ভাগ এবং বনানী-মগবাজার অংশের অগ্রগতি শতকরা ৩১ ভাগ। এ প্রকল্পের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি।

প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু

কর্মসংস্থান: বিশেষ প্রতিবেদন

১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগে বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি

দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ গণবিজ্ঞপ্তি ২০২২ প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৬ই ফেব্রুয়ারি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে শিক্ষক নিয়োগ সুপারিশের এ গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেসরকারি স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যাবসায় ব্যবস্থাপনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এন্ট্রি লেভেলের ১৫ হাজার ১৬৩ শিক্ষক পদে নিয়োগ সুপারিশ পেতে ৮ই ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে আবেদন শুরু হয়। আবেদনের শেষ সময় ছিল ২২শে ফেব্রুয়ারি। ১৫ হাজার ১৬৩ পদের মধ্যে

১২ হাজার ৮০৭টি এমপিওভুক্ত শূন্যপদ। নন-এমপিও পদ আছে ২ হাজার ৩৫৬টি।

দুই হাজার ছয়শো শ্রমিককে ১৫ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হবে

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে দুই হাজার ছয়শো ৪৩ জন শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে ১৫ কোটি ২৯ লাখ ৬০ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হবে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সভাপতিত্বে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ২৪তম বোর্ড সভায় এ সহায়তার অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত এবং দুর্ঘটনায় নিহত ৭৯ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৮৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত ২৩৩৯ জন শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৫ হাজার টাকা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় ১৩১ জনকে শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ৫৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। সভায় বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত স্বজন, আহত ৯৪ জন শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে জরুরিভিত্তিতে প্রদানকৃত এক কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়।

সকল শ্রমিকের ডিজিটাল ডাটাবেইজ করবে সরকার

প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিকের ডিজিটাল ডাটাবেইজ করবে সরকার। ডিজিটাল ডাটাবেইজ সম্পন্ন হলে কোন খাতে কত শ্রমিক নিয়োজিত তার প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে। শ্রমিকদের সকল প্রকার সুবিধা প্রদান সহজ হবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ানের সাথে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলির সাক্ষাৎকালে তাকে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রম মন্ত্রণালয় ৫ বছর মেয়াদি (২০২১-২০২৬) কর্মপরিকল্পনার উন্নয়ন করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ২০৪১ সালের আগেই উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বে।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূতকে জানানো হয়, ২০২৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ৫০ বছরে পৌঁছবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কর্মক্ষেত্রে কর্মপরিবেশের উন্নয়নের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্ত হয়েছে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২

বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর একুশে বইমেলা ২০২২' উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বইমেলার উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন তিনি। এসময় প্রধান অতিথির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'অমর একুশে বইমেলা ২০২২'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার ২০২২ প্রদান করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

বলেন, সাম্প্রতিক করোনা মহামারির কারণে গত বছর এবং এবছর অমর একুশে বইমেলা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমরা করোনা এবং অন্যান্য অসুস্থতায় বাংলা একাডেমির তিনজন সভাপতি– জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান এবং মহাপরিচালক কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজীকে হারিয়েছি। তাঁদের সবাইকে আমরা যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তেমনি একুশে বইমেলায় আগত সবাইকে নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে অনুরোধ করি। এবারের বইমেলার মূল প্রতিপাদ্য– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী।

প্রতিবছর ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বইমেলা শুরু হওয়ার রীতি থাকলেও করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে এবার বইমেলা শুরু হয় ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে। এই বইমেলা ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে। ছুটির দিন বইমেলা বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলে। এছাড়া মহান একুশে ফেব্রুয়ারি মেলা শুরু হয় সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত।

এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর এবং দেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের ৫০তম বার্ষিকী স্মরণে পালিত হয় অমর একুশে বইমেলা। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ এবং ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রায় সাড়ে ৭ লাখ বর্গফুট জায়গায় বইমেলা অনুষ্ঠিত

হয়। এ বছর ১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত একমাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার

সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ১৫ জনকে এ বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ২৩শে জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২১ সালের জন্য যারা মনোনীত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– কবিতায় আসাদ মান্নান, বিমল গুহ, কথাসাহিত্যে ঝর্ণা রহমান, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, প্রবন্ধ/গবেষণায় হোসেনউদ্দীন হোসেন, অনুবাদে আমিনুর রহমান, রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, নাটকে সাধনা আহমেদ, শিশুসাহিত্যে রফিকুর রশীদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় পান্না কায়সার, বঙ্গবন্ধু বিষয়ক গবেষণায় হারুন-অর-রশিদ, বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞানে শুভাগত চৌধুরী, আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনিতে সুফিয়া খাতুন, হায়দার আকবর খান রনো ও ফোকলোরে আমিনুর রহমান সুলতান।

১৫ই ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২২-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার তুলে দেন। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পর ১৯৬০ সাল থেকে নিয়মিতভাবে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে আসছে।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

২৮তম ভেসুল চলচ্চিত্র উৎসব

আট দিনব্যাপী ২৮তম ভেসুল চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতল মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর প্রথম আন্তর্জাতিক ভাষার ছবি *নো ল্যান্ডস ম্যান*। বহুল আলোচিত *নো ল্যান্ডস ম্যান* ভেসুল উৎসবে দর্শক পছন্দে সেরা ছবি নির্বাচিত হয়েছে। ১২ই ফেব্রুয়ারি এই উৎসবে *নো ল্যান্ডস ম্যান*-এর প্রথম প্রদর্শনী হয়। প্রথম শোতে উপস্থিত থাকতে না পারলেও দ্বিতীয় শোতে ১৩ই ফেব্রুয়ারি সশরীরে উপস্থিত হন নির্মাতা ফারুকী। চলচ্চিত্রটি সম্প্রতি বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, কায়রো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়।

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০ চূড়ান্ত সুপারিশ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় চলচ্চিত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কলাকুশলীদের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালে ২৮টি ক্যাটাগরিতে ৩২ জন পেতে পারেন এ পুরস্কার। যুগ্মভাবে আজীবন সম্মাননায় অভিনেত্রী আনোয়ারা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদের নাম উঠে এসেছে। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র যুগ্মভাবে সরকারি অনুদানের সিনেমা *গোর* ও *বিশ্বসুন্দরী*। শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র জান্নাতুল ফেরদৌসের *আড়ং*, শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র সৈয়দ আশিক রহমানের *বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক গাজী রাকায়েত হোসেন (*গোর*), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা প্রধান চরিত্রে মো. সিয়াম আহমেদ (*বিশ্বসুন্দরী*), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী প্রধান

চরিত্রে রোজালিন দীপান্বিতা মার্টিন (*গোর*), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পার্শ্বচরিত্রে এম ফজলুর রহমান (*বিশ্বসুন্দরী*), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী পার্শ্বচরিত্রে অপর্ণা ঘোষ (*গণ্ডি*), শ্রেষ্ঠ অভিনেতা খলচরিত্রে মো. সাহিদ হাসান মিশা সওদাগর (*বীর*), শ্রেষ্ঠ কৌতুক চরিত্র বিবেচিত হয়নি, শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী মুগ্ধতা মোরশেদ ঋদ্ধি (*গণ্ডি*), শিশুশিল্পী শাখায় বিশেষ পুরস্কার মো. শাহাদাৎ হোসেন বাঁধন (*আড়ং*), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক বেলাল খান (বিশ্বাস যদি যায়রে), শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচলক প্রয়াত মো. সহিদুর রহমান (তুই কি আমার হবিরে-*বিশ্বসুন্দরী*), শ্রেষ্ঠ গায়ক মো. মাহমুদুল হক ইমরানের (তুই কি আমার হবিরে-*বিশ্বসুন্দরী*), শ্রেষ্ঠ গায়িকা যুগ্মভাবে দিলশাদ নাহার কনা (তুই কি আমার হবিরে-*বিশ্বসুন্দরী*), সোমনূর মনির কোনাল (ভালোবাসার মানুষ তুমি-*বীর*), শ্রেষ্ঠ গীতিকার কবির বকুল (তুই কি আমার হবিরে-*বিশ্বসুন্দরী*), শ্রেষ্ঠ সুরকার মো. মাহমুদুল হক ইমরান (তুই কি আমার হবিরে-*বিশ্বসুন্দরী*), শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার গাজী রাকায়েত হোসেন (*গোর*), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার গাজী রাকায়েত হোসেন (*গোর*), শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা ফাখরুল আরেফীন খান (*গণ্ডি*), শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক উত্তম কুমার গুহ (*গোর*), শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক যুগ্মভাবে পঙ্কজ পালিত ও মো. মাহবুব উল্লাহ নিয়াজ (*গোর*), শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক কাজী সেলিম আহম্মেদ (*গোর*), শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জা এনামতারা বেগম (*গোর*), শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যান মোহাম্মদ আলী বাবুল (*গোর*)।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ৩০শে জানুয়ারি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা থেকে উপরোক্ত নামের সুপারিশ করা হয়। ২০২০ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জন্য জমা পড়েছিল মোট ১৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য, সাতটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও ছয়টি প্রামাণ্যচিত্র।

প্রতিবেদন : মিতা খান

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক বহন করা অবৈধ

ফেনসিডিলকে মাদক ঘোষণা করে তা পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। ১৯৯৭ সালে যশোরের চৌগাছায় ২৫০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক হন বাদল কুমার পাল। ২০০০ সালে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় বিচারিক আদালত। আপিলের পর ২০০৩ সালে তাকে খালাস দেয় হাইকোর্ট। রায়ে হাইকোর্ট যুক্তি দেখিয়ে বলে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ

আইন অনুযায়ী ফেনসিডিল বহন অপরাধ নয়। পরে ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল আবেদন জানায় রাষ্ট্রপক্ষ। সে আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয় ১৯শে জানুয়ারি। ১লা ফেব্রুয়ারি রায়ে বাদলকে বিচারিক আদালতের দেওয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা বহাল রাখার পাশাপাশি ফেনসিডিলকে মাদক হিসেবে উল্লেখ করে তা বহনও অবৈধ ঘোষণা করেছে সর্বোচ্চ আদালত।

বিজিবির অভিযানে এক মাসে ২১১ কোটি টাকার মাদক জব্দ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জানুয়ারি মাসে দেশের সীমান্ত এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২১১ কোটি ৬৭ লাখ ৯৮ হাজার টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য, চোরাচালান সামগ্রী ও অস্ত্র এবং গোলাবারুদ জব্দ করেছে। এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৬৭ জন এবং অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ২১৮ জন বাংলাদেশি ও ১৩ জন ভারতীয় নাগরিককে আটকের পর তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি সদর দফতর।

১লা ফেব্রুয়ারি গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জব্দকৃত মাদকের মধ্যে রয়েছে– ১৭ লাখ ৫২ হাজার ৯৯১ পিস ইয়াবা, ২১ কেজি ২৩৯ গ্রাম আইস, ৩২ হাজার ১৯৪ বোতল ফেনসিডিল, ১৬ হাজার ৪২৭ বোতল বিদেশি মদ, ২ হাজার ১০৯ ক্যান বিয়ার, ২ হাজার ১২৬ কেজি গাঁজা, ৭ কেজি ১৩৯ গ্রাম হেরোইন, ২ হাজার ২৪৯টি ইনজেকশন, ৬ হাজার ৭৬১টি ইস্কাফ সিরাপ, ২ হাজার ৫৭৫ বোতল এমকেডিল, ১ লাখ ৮১ হাজার ৫৩৮টি যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট এবং ১৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৬৫টি অন্যান্য ট্যাবলেট। জব্দকৃত অন্যান্য চোরাচালান পণ্যের মধ্যে রয়েছে ২ কেজি ৭০৮ গ্রাম সোনা, ৫৯ কেজি ৭৫ গ্রাম রুপা, ১ লাখ ৩৮ হাজার ২২৮টি কসমেটিক্স, ১৩ হাজার ৪২৯টি ইমিটেশন গহনা, ৮ হাজার ৪৯০টি শাড়ি, ১ হাজার ৬২৫টি বিভিন্ন ধরনের পোশাক, ২ হাজার ৩১৪ মিটার থান কাপড়, ৩ হাজার ৬০ ঘনফুট কাঠ, ৭ হাজার ৭১৪ কেজি চা পাতা, ১৩ হাজার ৭০০ কেজি কয়লা, ৬৯৫ কেজি কীটনাশক, ৭৫ কেজি গ্যামাক্সিন পাউডার, ১২টি ট্রাক-কাভার্ডভ্যান, ৫টি প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস, ১৮টি পিকআপ, ৩০টি সিএনজি-ইজিবাইক এবং ৬৩টি মোটর সাইকেল। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে– ৩টি পিস্তল, ২টি বন্দুক, ১৬ রাউন্ড গুলি, ৫টি ম্যাগাজিন, ৫টি খালি খোসা, ৬টি ডেটোনেটর এবং ৬টি আইইডি।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুতের আলো জ্বলবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, সারা দেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলবে এটা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার আনাচ-কানাচেও বিদ্যুতের আলো জ্বলবে। ১১ই ফেব্রুয়ারি বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলার মুনলাই পাড়ায় বিদ্যুৎ লাইন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এসময় মন্ত্রী বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যুতায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ২২৫ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছেন। যেসব জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না আগামী ৫ বছরের মধ্যে সেসব স্থানকে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে বিদ্যুতায়িত করা হবে। এছাড়াও মন্ত্রী রুমা উপজেলায় জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

করোনা রোধে সবাইকে মাস্ক পরিধান

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেন, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে মাস্ক পরতে হবে। নিজেকে সুস্থ রাখার পাশাপাশি অন্যকেও সুস্থ রাখতে হবে। সরকার প্রাণঘাতী করোনার বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট থেকে দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। জনগণকে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান মন্ত্রী। ৬ই ফেব্রুয়ারি বান্দরবান পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে করোনা সংক্রমণ রোধে মাস্ক পরিধানে উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, করোনার নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট ধরা পড়ছে, ইতোমধ্যে আমরা অনেক মানুষকে হারিয়েছি। সবাইকে টিকা নেওয়ার পাশাপাশি অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। এসময় তিনি আরও বলেন, মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করুন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাস্ক বিতরণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে বলে জানান মন্ত্রী। পরে মন্ত্রী বান্দরবান শহরের ট্রাফিক মোড়ে, যাত্রী, চালক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও জনগণের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন।

প্রতিবেদন : আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্যানসারে আক্রান্ত ৭০ শতাংশ শিশুই চিকিৎসায় সুস্থ হয়

দিন দিন দেশে ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, প্রতিবছর দেশে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হন। এদের মধ্যে ২০ হাজারই শিশু। আক্রান্ত এসব শিশুর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশই চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয় বলে জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)। ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব শিশু ক্যানসার দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু হেমাটোলজি ও অনকোলজি বিভাগের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব তথ্য জানান।

অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু হেমাটোলজি ও অনকোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. আতিকুর রহমান বলেন, ৯৩টি দেশের মধ্যে এ দিবসটি পালিত হয়। তিনি বলেন, দেশের শিশু ক্যানসার চিকিৎসায় সফলতাকে উন্নত বিশ্বের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের শিশু হেমাটোলজি ও অনকোলজি বিভাগ শুধু শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসাই করে না, চিকিৎসকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করে। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা সারা দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুর পরিবার যদি চিকিৎসায় লেগে থাকে, তাহলে আক্রান্তের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ ভাগ রোগী সুস্থ হয়।

৬২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন কারিকুলামের বই বিতরণ

শিক্ষায় নতুন কারিকুলাম চালু করেছে সরকার। পরীক্ষামূলকভাবে নতুন পাঠ্যসূচির পাঠদানের জন্য নির্বাচিত ৬২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) মতিঝিলে অনুষ্ঠিত এ বই বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

দীপু মনি বলেন, আমাদের প্রত্যাশা নতুন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ শিখতে পারবে। সবকিছুর সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানুষ হবে, নিজেরা চিন্তা করতে শিখবে, চিন্তার জগৎ প্রসারিত হবে, শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা প্রয়োগ করা শিখবে, সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবে, তার সমাধান খুঁজে বের করতে পারবে। আমরা শিক্ষার্থীদের সেভাবে গড়ে তুলতে চাই। সেই প্রত্যাশায় নতুন কারিকুলামের জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে পাইলটিং শুরু হবে মাধ্যমিক স্তরের ৬২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। এটা সফল হলে ২০২৩ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি থেকে বাস্তবায়ন করা হবে। ২০২৪ সালে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে এটি বাস্তবায়িত হবে। সে হিসেবে ২০২৪ সাল থেকে মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগ থাকছে না। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ২০২৩ সাল থেকে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। আর নতুন কারিকুলাম পাইলটিংয়ে যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এ বছর থেকে এ ছুটি চালু হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীর স্মার্টফোন নিশ্চিতের পরিকল্পনা

ব্লেন্ডেড শিক্ষাপদ্ধতির আওতায় ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীকে স্মার্টফোন/ডিভাইসের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনার কথা জানান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ। একই সময়ে বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি শতভাগ নিশ্চিত করা এবং ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপন করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। এছাড়া, ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে ডেটা সেন্টারের সুযোগ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে চাহিদার ভিত্তিতে শতভাগ শিক্ষার্থীকে ল্যাপটপ/ডিজিটাল ডিভাইসের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফরমে উচ্চশিক্ষায় ব্লেন্ডেড শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক উপ-কমিটির এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে ইউজিসি চেয়ারম্যান উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এসব পরিকল্পনার কথা বলেন।

প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য ইশারা ভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূলস্রোতে আনতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য দেশে ইশারা ভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'বাংলা ইশারা ভাষা দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহফুজা আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী খান খসরু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীদের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে সমঅধিকার নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতাহারেও সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভাগ্যোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। সেলক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের জন্য যে কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করেছেন সারা বিশ্বে তা প্রশংসিত হচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান শ্রেণিকেও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করার আহ্বান জানান।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. আশরাফ আলী বলেন, সরকার সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কর্মসূচির পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত আইন ও নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রতিবন্ধীরা সমাজের সম্পদে পরিণত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ভাতার আওতায় আনা হচ্ছে সকল প্রতিবন্ধীদের

দেশের সকল প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আসছে। এজন্য প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৮১ হাজার ১৯৯ জন প্রতিবন্ধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের সেবা ও সাহায্য কাঠামোর আইনি ভিত্তি দিতে 'প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন' প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া

হয়েছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে এ তথ্য জানানো হয়। কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সভাপতিত্বে বৈঠকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের আইনি কাঠামো প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও পরিসংখ্যান ব্যুরোকে সমন্বিতভাবে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার সুপারিশ করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেল ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ-এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ক্রীড়া সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন– পিআইডি

কমিটি সূত্র জানায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়নের পর প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যায় বিভ্রান্তি দেখা দেওয়ায় প্রতিবন্ধিতার ধরন ও উন্নয়ন বিবেচনায় নিয়ে একটি শনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে পরিচয়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ১২ ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষকে শনাক্ত করতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১২টি উপজেলা ও দুটি ইউসিডিতে প্রাথমিক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়।

এই প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন পর্যায়ে বাড়ি বাড়ি সমাজকর্মী পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এরপর ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রসমূহের পরামর্শকবৃন্দ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডাক্তারদের দ্বারা শনাক্তকরণের মাধ্যমে সনদপত্র দেওয়া হয়। পরে সারা দেশে প্রতিবন্ধী জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। যা এখনো চলমান রয়েছে।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

আফিফ-মিরাজের বিশ্ব রেকর্ড

স্বাগতিক বাংলাদেশ ও সফরকারী আফগানিস্তানের মধ্যকার প্রথম ওয়ানডেতে ৪ উইকেটের অবিস্মরণীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। জয়ে মূল অবদান আফিফ হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজের বিশ্ব রেকর্ড গড়া পার্টনারশিপের। ২৩শে ফেব্রুয়ারি টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ৪৯.১ ওভারে অলআউট হয়ে আফগানিস্তান জড়ো করে ২১৫ রান।

জয়ের লক্ষ্য ২১৬ রান, কিন্তু ৪৫ রানে বাংলাদেশ হারায় ছয় উইকেট। আফিফ হোসেন ও মেহেদী হাসান মিরাজের জুটিতে এরপর দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে জিতেছে বাংলাদেশ। আফিফ হোসেন অপরাজিত ছিলেন ৯৩ রানে, মিরাজ করেছেন অপরাজিত ৮১ রান। রান তাড়ায় বা দ্বিতীয় ইনিংসে সপ্তম উইকেটে বিশ্ব রেকর্ড জুটি এখন আফিফ-মিরাজের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তারা গড়েছেন অবিচ্ছিন্ন ১৭৪ রানের জুটি।

বিপিএল শিরোপা জিতল কুমিল্লা

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের (বিপিএল) ফাইনালে টানটান উত্তেজনা ম্যাচে ফরচুন বরিশালকে এক রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স। এর আগে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে শিরোপা জিতেছিল কুমিল্লা। ১৮ই ফেব্রুয়ারি মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে নির্ধারিত ওভার শেষে ৯ উইকেটে ১৫১ রান তুলে কুমিল্লা। জবাবে বরিশাল ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান করে।

ইন্দোনেশিয়ায় সেমিফাইনালে বাংলাদেশের শোভন ও রাব্বি

ছেলেদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে দেশসেরা শুটার আবদুল্লাহ হেল বাকিকে ছাড়াই জাকার্তায় গেছে বাংলাদেশ দল। এই ইভেন্টে বাংলাদেশের অন্য দুই শুটার শোভন চৌধুরী ও রাব্বি হাসান শুভ সূচনা করেছেন টুর্নামেন্টে। বাছাইপর্ব পেরিয়ে ৯ই ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছেন শোভন চৌধুরী ও রাব্বি হাসান। বাছাইপর্বে ৬৫৪ পয়েন্টের মধ্যে ৬২০.৮ স্কোর করেছেন শোভন, রাব্বি হাসান স্কোর করেছেন ৬২০.৩ পয়েন্ট। বাছাইয়ে নেওয়া ছয় সেট শটে শোভন করেছেন যথাক্রমে ১০৪.৭, ১০২.৯, ১০৩.৪, ১০৪.৪, ১০৩.০, ১০২.৪। আর রাব্বি হাসানের বাছাইয়ের স্কোর ছিল ১০২.৪, ১০৩.৯, ১০৩.৩, ১০৪.২, ১০২.৯ ও ১০৩.৬। অন্যদিকে মেয়েদের ১০মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলাদেশের নাফিশা তাবাসসুম। ১০ই ফেব্রুয়ারি জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় তৃতীয় ধাপে গিয়ে পদক জেতা নাফিশার স্কোর ৩৭।

মুশফিক পেলেন আইসিসি সুখবর

ওয়ানডের ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে ক্যারিয়ার সেরা অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছেন মুশফিক। বাংলাদেশ সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছিল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। লঙ্কানদের বিপক্ষে ওই সিরিজটিতে ব্যাট হাতে সেঞ্চুরির পাশাপাশি তিন ম্যাচে ৭৯ গড়ে ২৩৭ রান করেন এ অভিজ্ঞ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। এবার সেটিরই পুরস্কার পেলেন তিনি। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ওয়ানডে ফরম্যাটে ব্যাটার ও বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। আগে থেকেই বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়ানডে ফরম্যাটে সবার শীর্ষেই ছিলেন মুশফিক। আপডেট করা র‍্যাংকিংয়ের আগে মুশফিকের অবস্থান ছিল ১৪তম। এবার তিন ধাপ এগিয়ে ১১তম পজিশনে উঠে এসেছেন তিনি। তার রেটিং ৭২৩।

প্রতিবেদন : মো. মামুন হোসেন

না ফেরার দেশে কাজী রোজী

আফরোজা রুমা

কবি, রাজনীতিবিদ ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রোজী চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২০শে ফেব্রুয়ারি রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩০শে জানুয়ারি তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে স্ট্রোক করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি সাতক্ষীরায় জন্মগ্রহণ করেন কবি কাজী রোজী। তাঁর বাবা কাজী শহীদুল ইসলাম। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে সাহিত্যে স্নাতক ও এমএ পাস করেন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি চাকরি করেছেন। কাজী রোজী চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-তে *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ২০০৭ সালে তথ্য অধিদফতরের একজন কর্মকর্তা হিসেবে অবসর নেন। তিনি ষাটের দশকে কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো: *পথঘাট মানুষের নাম* (কাব্যগ্রন্থ), *নষ্ট জোয়ার* (কাব্যগ্রন্থ), *আমার পিরানের কোনো মাপ নেই* (কাব্যগ্রন্থ), *লড়াই* (কাব্যগ্রন্থ), *শহিদ কবি মেহেরুননেসা* (জীবনীগ্রন্থ), *রবীন্দ্রনাথ: রসিকতার কবিতা* (গবেষণা গ্রন্থ), *বাতাসের বৈঠা*, *মুজিবের বাঙালির স্বপ্নঘর*, *নির্বাচিত কবিতা*, *খানিকটা গল্প তোমার*, *ছড়ার ব্যঞ্জন*, *কবিতায় বলি কবিতায় জ্বলি*, *কবিতা সমগ্র-১*, *কবিতা সমগ্র-২*, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, *মানুষের গল্প*, *মধ্যিখানে সিঁথি-কাটা পুরুষ গো*, *শেখ মুজিবুর বাঙালির বাতিঘর*, *মানুষের কাব্য* ইত্যাদি।

কাজী রোজী জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে প্রথমাবস্থায় নির্বাচিত অপর ৪৭ জন সদস্যের সঙ্গে ২০১৪ সালের ১৯শে মার্চ 'সংসদ সদস্য' পদে নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

কাজী রোজী মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের চতুর্থ সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন।

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (১৪১৯), সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার (২০১৩), ২০২১ সালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত হন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি ও সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রোজীকে বাংলা একাডেমিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানান রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, 'কাজী রোজী তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে কাজ করে গেছেন। একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।'

শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কবিতার পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে তাঁর সাহসী ভূমিকা স্মরণীয় থাকবে।'

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় কাজী রোজীর কর্মময় জীবনের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানকারী কাজী রোজীর মৃত্যুতে দেশ একজন সাহসী, সাহিত্যিক, স্বদেশ অন্তপ্রাণকে হারালো।'

আমরা মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 42, No. 10, March 2022, Tk. 25.00

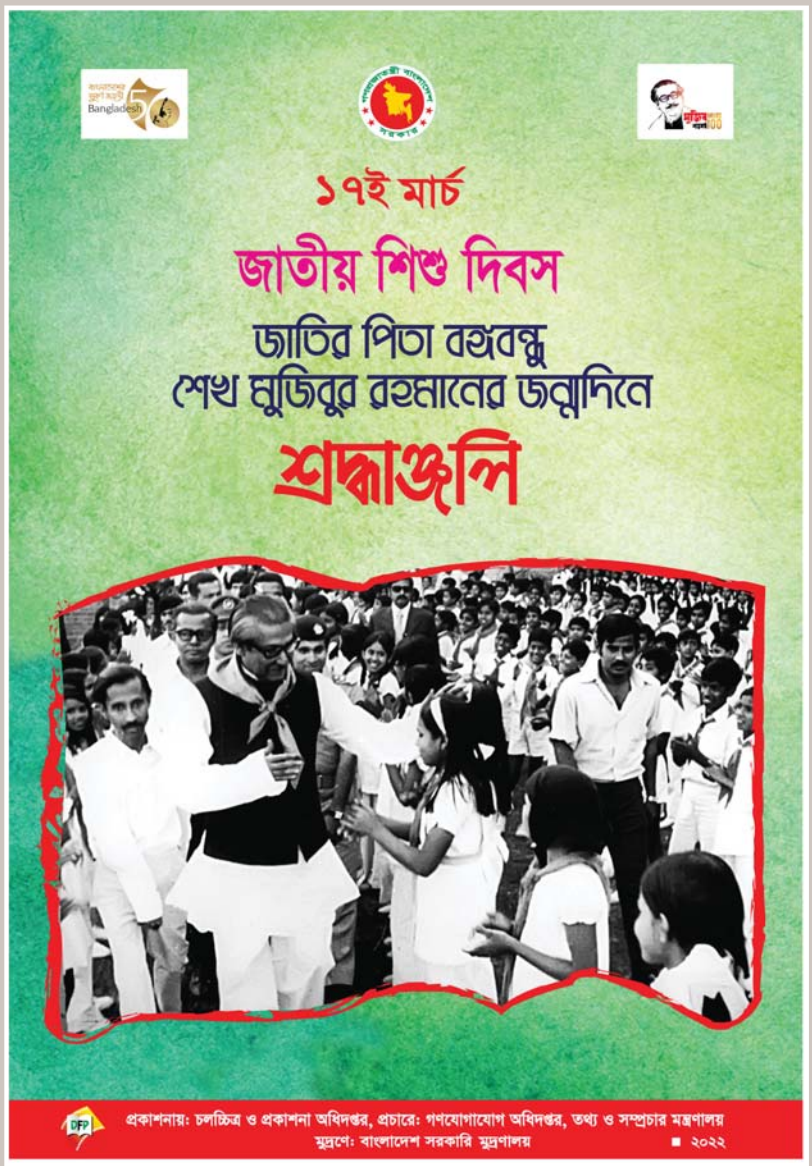

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd